আকীদার মানদণ্ডে তাবীজ

[বাংলা]

التمائم

[اللغة البنغالية]

লেখক : আলী বিন নুফাই আল-উলইয়ানী

تأليف : علي بن نفيع العلياني

অনুবাদ: ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

ترجمة : المهندس محمد مجيب الرحمن

ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1429 – 2008

islamhouse.com

আকীদার মানদণ্ডে

তাবীজ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য এবং দরুদ ও সালাম রাসূলুল্লাহর সা. প্রতি ।

তাবীজ সম্পর্কে হরেক রকমের বই পুস্তক বাজারে রয়েছে । ঐ সব বইয়ে তাবীযের স্বপক্ষে কোন সমর্থনযোগ্য বর্ণনা নেই, অথচ অনেক কিচ্ছা কাহিনীসহ অসংখ্য তাবীযের বর্ণনা ও ফাযায়েলে ভরপুর । এই সব বই পড়ে যে কোন মানুষ বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন, রোগ, যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের আশায় তাবীজ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হয় । তাবীযের ব্যবহার আজ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে উঠেছে ।

প্রখ্যাত গবেষক ড: আলী আল-উলাইয়ানী তাঁর আকীদার মানদণ্ডে তাবীজ নামক পুস্তিকায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গিতে তাবীযের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করেছেন । তাবীজ ব্যবহার শরীয়ত সম্মত কিনা- এর পক্ষের ও বিপক্ষের দলীল সমূহ তিনি কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন । এতে তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য পেশ করার পর এটা প্রমাণ করেছেন যে, তাবীযের যে রেওয়াজ বর্তমানে প্রচলিত আছে তার অধিকাংশই সহীহ ‘আকীদার পরিপন্থী এবং সরলপ্রাণ মুসলিমদেরকে তাদের অজ্ঞতার সুযোগে ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ তথা বাঁচা মরার অবলম্বন হিসাবে বেছে নিতে

প্ররোচিত/ উদ্বুদ্ধ করছে এবং এর ফলে তারা নিজেদের অজান্তে বিদ‘আত ও শিরকের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেন:

وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿المائدة٢٣﴾

অর্থাৎ ((তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা কর, যদি মুমিন হয়ে থাক)) । (সুরা মায়িদা ২৩ আয়াত) ।
রাসূল সা. বলেছেন:

من تعلق تميمة فلا أتم الله له

অর্থাৎ (যে তাবীজ ব্যবহার করবে, আল্লাহ তাকে পূর্ণতা দেবেন না) ।
আল্লাহ ওয়া জাল্লা শানুহু আমাদেরকে শিরক থেকে মুক্ত রাখুন এবং তাঁর ক্রোধ ও জাহান্নামের আগুন থেকে হিফাযত করুন, আমাদের যাবতীয় প্রয়োজনে তাঁর সাহায্য কামনা করার ও মুছীবতের সময় একমাত্র তাঁর উপর নির্ভর করার যে নির্দেশনা কুরআন মাজীদ ও রাসূলুল্লাহ্‌র সা. সুন্নাহ্‌র মধ্যে রেখেছেন তা পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করার তাওফীক তিনি আমাদের সবাইকে দান করুন- আমীন!

অনুবাদক

লেখকের কথা

إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের, আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁরই নিকট গুনাহ হতে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাঁরই কাছে হেদায়েত প্রার্থনা করছি। তাঁরই নিকট আরও আশ্রয় চাচ্ছি আমাদের নফ্‌সের ও 'আমলের খারাবী হতে। যাকে আল্লাহ্‌পাক হেদায়েত দান করেন কেউ তাকে গোমরা করতে পারে না, আর যে গুমরাহ হয় কেউ তাকে হেদায়েত করতে পারে না। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। তিনি এক এবং তাঁর কোন শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সা. তাঁর বান্দা ও রাসূল।

অতএব, যে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে না, তার মধ্যে ঈমান নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿المائدة٢٣﴾

অর্থাৎ ((তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা কর, যদি মুমিন হয়ে থাক))। (সুরা মায়িদা ২৩ আয়াত)।

অন্যত্র আল্লাহ রাব্বুল ইয্‌যত বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿الأنفال٢﴾

অর্থাৎ ((নিশ্চয়ই মুমিনরা এরূপই হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তার আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন সেই আয়াতসমূহ তাদের ঈমানকে আরও বৃদ্ধি করে, আর, তারা নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে))। (সূরা আনফাল: ২ আয়াত)।

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা ঈমানের একটি শর্ত। আর আল্লাহর প্রতি সত্যিকার তাওয়াক্কুলের অর্থ এই যে, বান্দা এই বিশ্বাস রাখবে যে, সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, আল্লাহ যা চান তাই হয়, আর তিনি যা চান না তা হয় না। আর তিনিই একমাত্র কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক, দেয়া না দেয়ার মালিক, আর একমাত্র আল্লাহর সাহায্যেই ভাল কাজ করার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার সৌভাগ্য হয়।

যেমন রাসূলুল্লাহ সা. ইবন আব্বাসকে (রা:) উদ্দেশ্য করে বলেন–

يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذاسألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولواجتمعوا على أن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. (مسند أحمد)

অর্থাৎ (হে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শেখাব। যদি তুমি সেগুলো হিফাযত কর, তাহলে আল্লাহ তোমাকে

হিফাযত করবেন। আল্লাহর হুকুম আহকামের হিফাযত কর, তাঁকে শিরক, কুফর থেকে মুক্ত রাখবে, তবেই একমাত্র সাহায্যকারী হিসাবে তাঁকে তোমার কাছে পাবে। আর যখন কোন কিছু যাচঞা করবে, তখন আল্লাহর কাছে যাচঞা কর, আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, একমাত্র তাঁর কাছেই করবে। এবং জেনে রেখো- তোমার উপকার করার জন্য পৃথিবীর সকল মানুষ একত্রিত হলেও আল্লাহ তোমার জন্য তাক্বদীরে যে মঙ্গল লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তা ছাড়া অন্য কোন প্রকার মঙ্গলই তারা করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমার কোন ক্ষতি করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে তাক্বদীরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমার জন্য যে ক্ষতি লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত অন্য কোন ক্ষতিই তারা করতে পারবে না। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, আর দফতর বন্ধ করে ফেলা হয়েছে)। (মুস্নাদে আহ্মদ, প্রথম খণ্ড)

অতএব, মানুষের উদ্দেশ্য পূরণ হবার জন্য তাওয়াক্কুল সর্বোত্তম মাধ্যম। এবং তাওয়াক্কুলের কারণে বালা-মুসিবত দূর হয়ে যায়। তবে তাওয়াক্কুল পরিপূর্ণ হবার শর্ত হচ্ছে, মাধ্যমের প্রতি ঝুঁকে না পড়া। অর্থাৎ মাধ্যমের সাথে, অন্তরের সম্পর্ক ছিন্ন করা। সুতরাং, একজন পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুলকারী মু'মিনের অবস্থা হবে এই যে, তার অন্তর থাকবে আল্লাহর সাথে, আর শরীর থাকবে আসবাব অর্থাৎ মাধ্যমের সাথে।

কারণ, মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহর হিকমতের স্থান, তাঁর আদেশ এবং বিধান। আর তাওয়াক্কুলের সম্পর্ক আল্লাহর রুবূবিয়্যত

তথা প্রভুত্ব এবং তাঁর বিচার ও তাঁর তাক্বদীরের সাথে। এ জন্যই তাওয়াক্কুল ব্যতীত মাধ্যমের সাহায্য গ্রহণ আল্লাহর দাসত্বে শামিল হয় না। অনুরূপভাবে, আল্লাহর দাসত্ব ছাড়া কোন তাওয়াক্কুল সঠিক হয় না। তাওয়াক্কুল যখন দুর্বল হয়, অন্তর তখন মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং স্রষ্টা থেকে গাফিল হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায়,গাফিলতি এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যে, প্রকৃত মাধ্যমের উপর ভরসা না করে, মানুষ কতকগুলি মন গড়া মাধ্যমকে ভরসার স্থল বানিয়ে নেয়। আর এটাই হচ্ছে আগেকার যুগে ও বর্তমান যুগে তাবীজ ভক্তদের অবস্থা!!যেহেতু যাদুকর, কুসংস্কারবাদী, সুফীবাদ, গণক চিকিৎসক এবং ঝাড়-ফুঁকের চিকিৎসার অভিযোগে অভিযুক্ত দাজ্জালদের কারণে পৃথিবীর অনেক স্থানে তাবীযের ব্যবহার প্রসার লাভ করেছে, সেহেতু তাবীযের তত্ত্ব ও আহ্লে-সুন্নত ওয়াল জামা'আতের বিশুদ্ধ আকীদার দৃষ্টিতে তার হুকুম ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা সমীচীন মনে করছি।

বইতে যা যা আছে ......

ভূমিকা

তাবীযের সংজ্ঞা

লেসান নামক অভিধানে বলা হয়েছে- তামীম অর্থ হচ্ছে তাবীজ (রক্ষা কবজ) শব্দটির একবচন তামীমা। আবু মনসুর বলেছেন, তামীম দ্বারা তাবীজ বুঝানো হয়েছে, যা মানুষ বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ব্যবহার করে থাকে। এমনিভাবে বলা যায় যে, বিষধর সাপ ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য যে পূতি জাতীয় তাবীজ সূতায় গেঁথে গলায় বেঁধে দেয়া হয়, তাকেই তামায়েম কিংবা তামীমা অর্থাৎ তাবীজ বলা হয়।

ইবনে জোনাই রহ. থেকে বর্ণিত অনেকের মতে তাবীজ হচ্ছে ঐ জিনিস, যা তাগায় বেঁধে লটকানো হয়। সা'আলব রহ. থেকে বর্ণিত আছে- আরবরা বলে تممت المولود এর অর্থ হল- আমি শিশুর গলায় তাবীজ ঝুলিয়ে দিয়েছি। এক কথায় বলা যায় যে, মানুষের গলায় বা অন্যান্য অঙ্গে ৬বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য যেসব তাবীজ ধারণ করা হয়, সেগুলিকেই তামীমা বলা হয়।

ইবনে বরী বলেন- কবি সালমা বিন খরশবের নিম্ন বর্ণিত কবিতায় "তামীমা" এর অর্থই গৃহীত হয়েছে। কবি বলেন:

تعوذ بالرقي من غير خبل

وتعقد في قلائدها التميم

অর্থাৎ ঝাড়-ফুঁক এবং তাবীজ তুমারের মাধ্যমে নিশ্চিন্তে বিপদে থেকে আশ্রয় গ্রহণ করবে। আর তার গলায় তাবীজ বেঁধে দেবে। আবু মনসুর বলেছেন, التمائم একবচন হচ্ছে تميمة আর তমীমা হল, দানা জাতীয় তাবীজ। বেদুঈনরা বদ নজর থেকে হিফাজতে থাকার জন্য এ ধরনের তাবীজ তাদের শিশুদের এবং তাদের সন্তানদের গলায় লটকিয়ে দিত। ইসলাম তাদের এরকম কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা বাতিল করে দেয়।

হাজলী তার নিম্ন-বর্ণিত কবিতা থেকে এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন:

وإذا المنية أنشبت أظفارها أنفيت كل تميمة لا تنفع

অর্থাৎ- সে মৃত্যুবরণ করলে, মৃত্যুর পর মুজায়েনা (একটি গোত্রের নাম) তাকে মৃত্যু থেকে বাঁচানোর ব্যাপারে সফল হবে না। সুতরাং, হে মুজায়েন! তার উপর তাবীজ ঝুলিয়ে দাও। আল্লামা ইবনে হাজার বলেন, التمائم হল تميمة এর বহুবচন। আর তা হচ্ছে তাবীজ বা হাড় যা মাথায় লটকানো হয়। জাহেলী যুগে মানুষের বিশ্বাস ছিল যে, তাবীজ দ্বারা বিপদ আপদ দুর হয়ে যায়।

ইবনূল আছীর বলেছেন التمائم শব্দটি বহুবচন, এর এক বচন হল تميمة অর্থ- তাবীজ। আরবরা শিশুদের গলায় তাবীজ লটকাত, যাতে বদ নজর না লাগে। ওটাই তাদের আকীদাহ্। অতঃপর ইসলাম তাদের এই আকীদাকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করেছে। ইবনে উমরের রহ. হাদীসে এসেছে-

তুমি যে 'আমল করেছে, আমি তার কোন পরোয়াই করি না (অর্থাৎ তার কোন মূল্যই নেই) যদি তুমি তাবীজ লটকাও। অন্য এক হাদীসে এসেছে, যে তাবীজ ব্যবহার করে, আল্লাহ তার কোন কিছুই পূর্ণ করবেন না। (কারণ সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাবীযের উপর ভরসা করেছে) বস্তুত: আইয়ামে জাহেলিয়া তথা জাহেলী যুগে মানুষের ধারণা ছিল, তাবীজ হচ্ছে রোগমুক্তি ও চিকিৎসার পরিপূর্ণতা। তাবীজ ব্যবহার করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবার কারণ হচ্ছে এই যে, এতে লিখিত তাক্বদীরকে উপেক্ষা করার ইচ্ছা থাকে। এবং আল্লাহ একমাত্র তাক্বদীরের নিয়ন্ত্রণকারী, অথচ তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের মাধ্যমে ক্ষতি ও দুঃখ কষ্ট দুর করার চেষ্টা করা হয়। এর উপরোল্লিখিত আভিধানিক সংজ্ঞাসমূহ দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে এই যে, এতে লিখিত তাক্বদীরকে উপেক্ষা করার ইচ্ছা থাকে। এবং আল্লাহ একমাত্র তাক্বদীরের নিয়ন্ত্রণকারী, অথচ তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের মাধ্যমে ক্ষতি ও দুঃখ কষ্ট দুর করার চেষ্টা করা হয়। এর উপরোল্লিখিত আভিধানিক সংজ্ঞাসমূহ দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তাবীজ দুই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। প্রথমত: ঐ সমস্ত রোগ-ব্যাধি এবং বদ নজর থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে, যা এখনও সংঘটিত হয়নি। শিশুর গলায়, ঘোড়ার ঘাড়ে এবং ঘর-বাড়িতে যে সকল তাবীজ ঝোলানো হয়, সেগুলিতে উক্ত উদ্দেশ্য স্পষ্ট। দ্বিতীয়ত: যে বিপদ এসে গেছে, তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা যে তাবীজ ব্যবহার করে, তার

উদ্দেশও স্পষ্ট। ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে।
উল্লেখ্য যে, “বিষধর সাপ থেকে বাঁচার জন্য যে তাবীজ নেয়া হয়, তাকে তামীমা বলে।” এ ধরনের সংজ্ঞা দ্বারা নির্দিষ্ট অর্থ বুঝা গেলেও মূলত: তামিমা শুধু ওতেই সীমাবদ্ধ নয়। কারণ, আরবরা خرز (দানা জাতীয় তাবীজ) ব্যতীত অন্যান্য তাবীজও ব্যবহার করত। যেমন, তারা খরগোশের হাড় তাবীজ হিসাবে ব্যবহার করত, আর এর দ্বারা তারা মনে করত, বদ নজর ও যাদু থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সুতরাং, তাদেরকে এটা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।
যেমন হাদীসে এসেছে- ঘোড়ার ঘাড়ে লটকানো ধনুকের ছিলাসমূহ ছিঁড়ে ফেলার জন্য রাসূল সা. আদেশ করেছেন। মোদ্দা কথা, উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য দ্বয়ের জন্য যা কিছুই ব্যবহার করা হোক না কেন, সেটাই হচ্ছে তামিমা তথা তাবীজ। সেটা حرز হোক বা কাঠ জাতীয় বস্তু হোক। সেটা ঘাস বা পাতা হোক, অথবা খনিজ জাতীয় পদার্থ হোক, অর্থাৎ তাবীজ বস্তুটি যাই হোক না কেন, তা মন্দ থেকে হিফাযতে থাকার জন্য অথবা মন্দকে দুর করার জন্য ব্যবহার করা হলে تميمة এর অন্তর্ভুক্ত হবে, অর্থাৎ সেটা শিরক হবে। কারণ, বস্তুর সত্তা এবং উদ্দেশ্যটাই বিবেচ্য হয়, তার নাম যাই দেয়া হোক না কেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মদের মূল কাজ হচ্ছে মানুষের জ্ঞান , বুদ্ধি আচ্ছন্ন করা। অতএব, যে সকল বস্তু পান বা ভক্ষণ করলে

বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে যায়, সেগুলিই মদ। মদ হবার জন্য আঙ্গুর থেকে তৈরি হতে হবে, এমন কোন শর্ত নেই। আর তাবীযের ব্যাপারটিও তাই। এখানে কোন নির্দিষ্টতা নেই।

প্রথম পরিচ্ছেদ
তাবীজ হারাম হওয়ার দলীল সমূহ

প্রথমত: পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿الأنعام١٧﴾

অর্থাৎ ((আর যদি আল্লাহ তোমাকে কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী আর কেউ নেই, পক্ষান্তরে যদি তোমার কল্যাণ করেন, তবে তিনিই তো সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান)) । (সুরা আন'আম ১৭ আয়াত)।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (يونس) ﴿١٠٧﴾

অর্থাৎ ((এবং আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দিলে, তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নেই, এবং আল্লাহ যদি তোমার মঙ্গল চান, তাহলে তার অনুগ্রহ রদ করারও কেউ নেই। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু))। (সুরা ইউনুস ১০৭ আয়াত)

অন্যত্র আল্লাহ বারী তাআলা বলেন:

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿النحل٥٤﴾

অর্থাৎ ((তোমরা যে সমস্ত অনুগ্রহ ভোগ কর, তা তো আল্লাহরই নিকট হতে; আবার যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুল ভাবে আহ্বান কর। আর যখন আল্লাহ তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করেন, তখন তোমাদের এক দল তাদের প্রতিপালকের সাথে শরিক করে)) । (সুরা নাহ্‌ল ৫৩ ও ৫৪ আয়াত) ।

উপরোল্লিখিত আয়াত সমূহ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, দুঃখ-কষ্ট দুর করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। আর বান্দা একমাত্র তাঁর কাছেই ভাল-মন্দের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আর তিনিই একমাত্র শক্তিধর, যিনি কোন মাধ্যমে বা বিনা মাধ্যমে মঙ্গল, অমঙ্গল সাধনে সক্ষম।

মাধ্যম আবার দুই প্রকার। শরীয়তী মাধ্যম ও প্রকৃতিগত মাধ্যম।

শরীয়তী মাধ্যম

শরীয়তী মাধ্যম হলো, যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সরাসরি কুরআনের আয়াতে বর্ণনা করেছেন এবং হাদীছ শরীফে তার বর্ণনা রয়েছে। যেমন: দুআ এবং শরীয়ত সম্মত ঝাড় ফুক। শরীয়তী মাধ্যম সমূহ আল্লাহর অনুগ্রহে এবং তার ইচ্ছায় বান্দার মঙ্গল সাধন করে বা অমঙ্গল দূরীভূত করে। সুতরাং, এ সমস্ত মাধ্যম ব্যবহারকারী প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর কাছেই আশ্রয় গ্রহণ করে। কারণ, তিনিই এগুলি ব্যবহার করার উপদেশ দিয়েছেন এবং বান্দাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, এগুলিই হচ্ছে মাধ্যম। তাই ভরসা রাখতে হবে শুধু আল্লাহর উপর, মাধ্যমের উপর নয়। কেননা, তিনিই এ সমস্ত মাধ্যম সমূহ তৈরি করেছেন। এগুলি দ্বারা মঙ্গল-অমঙ্গল দান করার ক্ষমতা তাঁরই হাতে। অতএব, শুরু, শেষ তথা সর্বাবস্থায় তাওয়াক্কুল থাকতে হবে তাঁরই উপর।

আর প্রাকৃতিক মাধ্যম হচ্ছে বস্তু এবং তার প্রভাবের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক, যা খুবই স্পষ্ট, এমনকি মানুষ সেটা বাস্তবে অনুভাব বা উপলব্ধি করতে পারে। যেমন: পানি পিপাসা দূর করার মাধ্যম। শীতবস্ত্র শীত নিবারণের মাধ্যম। তদ্রুপ বিভিন্ন কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি করা ঔষধ রোগ জীবাণু ধ্বংস করে দেয়। এ সবই হচ্ছে প্রাকৃতিক মাধ্যম। ইসলামী শরীয়ত এগুলি ব্যবহার করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছে। কারণ, এগুলি ব্যবহার করার অর্থই হচ্ছে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা, যিনি এ সমস্ত জিনিসে নির্দিষ্ট গুণাবলি দান করেছেন, এবং তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন সময় এসব গুণ বাতিল করে দিতে পারেন, যেমন বাতিল করেছিলেন ইব্রাহিমের আ. জন্য প্রজ্বলিত আগুনের দাহন শক্তি। কিন্তু তাবীজাবলীর মধ্যে আদৌ কোন ফলদায়ক প্রভাব নেই এবং তা কোন অমঙ্গল দূর করতে পারে না। এতে জড়

বস্তুর কোন প্রভাব নেই। তাছাড়া, মহান আল্লাহ এগুলিকে কোন শরয়ী' মাধ্যম হিসাবে নির্ধারণ করেনি। এবং মানুষ স্বাভাবিক ভাবে এগুলির কোন প্রভাব প্রতিক্রিয়াও অনুভব করে না, দেখতেও পায় না। এতেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এগুলির উপর ভরসা করা, মুশরিকদের মৃত ব্যক্তি এবং মূর্তির উপর ভরসা করার সমতুল্য, যারা না শুনে, না দেখে, না পারে কোন উপকার করতে, আর না পারে কোন ক্ষতি সাধন করতে। কিন্তু তারা মনে করে, এগুলি আল্লাহর কাছ থেকে তাদের জন্য উপকার বয়ে নিয়ে আসবে, অথবা অমঙ্গল প্রতিহত করবে। তারা আরো ধারণা পোষণ করে যে, এগুলির মধ্যে নির্ধারিত বরকত রয়েছে, পূজারিদের মধ্যে ঐ বরকত স্থানান্তরিত হয়ে তাদের ধন সম্পদ ও রিয্কের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সেগুলিকে বরকতময় করে তোলে। তাবীজসমূহ হারাম হওয়ার দলীলের মধ্যে নিম্ন বর্ণিত আয়াত সমূহ অন্যতম। আল্লাহ রাব্বুল ইযযত বলেন:

وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿المائدة٢٣﴾

অর্থাৎ ((আর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর উপরই ভরসা কর))। (সূরা মায়িদা ২৩ আয়াত)। শায়খ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব বলেন- ইবনুল কায়্যিম রহঃ বলেছেন, উক্ত আয়াতে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করাকে ঈমানের শর্ত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। অতএব, বুঝা যাচ্ছে যে, তাঁর উপর তাওয়াক্কুল না থাকলে ঈমানই থাকবে না। অন্য

আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মূসার আ. জবানীতে বলেন:

يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿يونس٨٤﴾

অর্থাৎ ((হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে থাক, যদি তোমরা আত্ম সমর্পণকারী হও, তাহলে তোমরা তাঁরই উপর নির্ভর কর।)) (সুরা য়ূনুস ৮৪ আয়াত)

এখানে বলা হয়েছে, তাওয়াক্কুল হলো ইসলামে শুদ্ধ হওয়ার দলীল কিংবা প্রমাণ। অন্যত্র আল্লাহ ওয়া জাল্লা শানুহু বলেন:

وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿إبراهيم١١﴾

অর্থাৎ ((আর মুমিনদের উচিত আল্লাহর উপরই নির্ভর করা)) (সুরা ইব্রাহীম, ১১ আয়াত)। এখানে মুমিনদের অন্যান্য গুণ বাচক নাম উল্লেখ না করে এজন্যই মুমিন উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমানের দাবিদার হওয়ার জন্য তাওয়াক্কুল থাকা শর্ত এবং তাওয়াক্কুলের শক্তি ও দুর্বলতা, ঈমানের শক্তি ও দুর্বলতার উপর নির্ভর করে। বান্দার ঈমান যতই মজবুত হবে, তার তাওয়াক্কুলও ততই শক্তিশালী হবে। আর যখন ঈমান দুর্বল হয়ে যাবে, তাওয়াক্কুলও তখন দুর্বল হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহর পবিত্র ক্বুর'আনের কোন কোন স্থানে তাওয়াক্কুল ও ইবাদতকে একত্রে উল্লেখ করেছেন, আবার কোথাও তাওয়াক্কুল ও ঈমানকে একত্রে অথবা তাওয়াক্কুল ও তাক্বওয়াকে একত্রে উল্লেখ করেছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাওয়াক্কুল ও ইসলাম একই সাথে কিংবা তাওয়াক্কুল ও হেদায়েত একত্রে

বর্ণনা করেছেন ।

অতএব স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ঈমান ও ইহ্সানের সর্ব স্তরে এবং ইসলামী সকল কার্যাবলীর মূল হচ্ছে তাওয়াক্কুল । শরীরের সাথে যেমন মাথার সম্পর্ক, সকল ইবাদতের সাথেও তদ্রুপ তাওক্কুলের সম্পর্ক । শরীর যেমন মাথা ছাড়া দাঁড়াতে পারে না, তেমনি ঈমানী কার্যাবলীও তাওয়াক্কুল ছাড়া গ্রহণযোগ্য হতে পরে না । শায়খ সুলায়মান বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব বলেন- উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা ইবাদত এবং ইহা ফরয । এ জন্যই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারে উপর তাওয়াক্কুল করা শিরক । শাইখুল ইসলাম বলেন, মানুষের উপর ভরসা ও তাওয়াক্কুল করা শিরক । আল্লাহ ওয়া জাল্লা শানুহু বলেন:

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿الحج٣١﴾

অর্থাৎ ((এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ল, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে এ দুরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল)) । (সুরা হাজ্জ, ৩১ আয়াত) ।

শায়খ সুলায়মান আরো বলেছেন- গাইরুল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল দুই প্রকার ।

এক: এমন সব বিষয়ে গাইরুল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করা, যা বাস্তবায়ন করতে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সক্ষম নয় । উদাহরণ স্বরূপ, ঐ সমস্ত লোকদের কথা বলা যেতে পারে, যারা মৃত্যু ব্যক্তি ও শয়তানের (মূর্তি) উপর তাওয়াক্কুল করে এবং তাদের কাছে হিফাযত, রিয্ক ও শাফায়াতের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে । এটা বড় শিরক । কারণ, ঐ সমস্ত জিনিসের উপর আল্লাহ ছাড়া আর কারো ক্ষমতা নেই ।

দুই: স্বভাবগত স্পষ্ট জিনিসের উপর তাওক্কুল । যেমন, কেউ রাজা-বাদশাহ্ বা আমীরের উপর এমন বিষয়ে তাওয়াক্কুল করল যা আল্লাহপাক তাদের ক্ষমতার আওতাধীন করে রেখেছেন । যথা: খাদ্য প্রদান বা কারো ক্ষতি থেকে বাঁচানো ইত্যাদি ইহা শিরকে খফী (অপ্রকাশ্য শিরক) বা ছোট শিরক । তবে অন্যের উপর কোন ব্যাপারে নির্ভর করা জায়েয, যদি ঐ ব্যক্তি ঐ কাজ করার যোগ্যতা বা ক্ষমতা রাখে । কিন্তু তার উপর তাওয়াক্কুল করা জায়েয হবে না, যদিও তাকে ঐ কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে । বরং তাওয়াক্কুল করবে একমাত্র আল্লাহর উপর, যাতে তিনি কাজটি সহজ করে দেন । শাইখুল ইসলামও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন । এখানে উল্লেখ্য যে, সম্পূর্ণরূপে তাবীজাবলীর উপর ভরসা করা নিঃসন্দেহে প্রথম প্রকারের শিরকের অন্ত র্ভুক্ত । অর্থাৎ, মৃত্যু ব্যক্তি বা মূর্তি ইত্যাদির উপর ভরসা করার মতো, যেগুলির কোন ক্ষমতা নেই এবং প্রকাশ্য

স্বভাবগত কোন মাধ্যমও তাতে নেই। এ বিষয়ে শেষের দিকে আরো স্পষ্ট আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্ ।

দ্বিতীয়ত: হাদীসের আলোকে তাবীজাবলী হারাম হওয়ার স্বপক্ষে বহু সহীহ হাদীস আছে, তন্মধ্যে:

أن النبي صلي الله عليه وسلم رأي رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة قال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا فانك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا (أحمد ابن ماجة و حاكم)

অর্থাৎ ইমরান বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম সা. এক ব্যক্তির হাতে তামার চুড়ি দেখতে পেয়ে বললেন, এটা কি? সে বলল: এটা ওয়াহেনার অংশ।[১] তিনি বললেন: এটা খুলে ফেল, কারণ এটা তোমার দুর্বলতা বাড়ানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না। যদি এ তাবীজ বাঁধা অবস্থায় তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে কখনও সফলকাম হতে পারবে না। (সহীহ, মুসনাদে আহমদ, হাকেম, ইবনে মাজাহ্) ।

২।

من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. (أحمد وحاكم)

উকবা বিন আমের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌কে সা. বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি তাবীজ ব্যবহার

[১] ওয়াহেনা অর্থ, এক প্রকার হাড়। যা থেকে কেটে ছোট ছোট তাবীয আকারে দেয়া হয়।

করবে, আল্লাহ তাকে পূর্ণতা দেবেন না, আর যে কড়ি ব্যবহার করবে, আল্লাহ তাকে মঙ্গল দান করবেন না। (আহমদ, হাকেম) ।

৩। أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا قال: إن عليه تميمة فادخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميمة فقد أشرك. (أحمد وحاكم)

উকবা বিন আমের আল-জোহানী রা. থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ্‌র সা. খেদমতে একদল লোক উপস্থিত হল। অতঃপর দলটির নয়জনকে বায়াত করালেন এবং একজনকে করালেন না। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল সা.! নয়জন কে বায়াত করালেন, আর একজনকে বাদ রাখলেন? রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: তার সাথে একটি তাবীজ রয়েছে। তখন তার হাত ভিতরে ঢুকালেন এবং সেটা ছিড়ে ফেললেন। অতঃপর তাকেও বায়াত করালেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি তাবীজ ব্যবহার করল সে শিরক করল। (সহীহ মুসনাদে আহমদ, হাকেম) ।

৪। একদা হুজায়ফা রা: এক রোগীকে দেখতে এসে তার বাহুতে একটি তাগা দেখতে পেলেন, অতঃপর তিনি তা কেটে ফেললেন বা ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন- যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, তাদের অনেকেই শিরক করছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর) ।

এ থেকে প্রমাণিত হয়, হুজায়ফার রা. মতে তাবীজ ব্যবহার করা শিরক এবং সর্বজন বিদিত এই যে, এটা তাঁর মনগড়া

কথা নয় (অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে রাসূলের সা. নির্দেশনা পেয়েই তিনি এ কথা উল্লেখ করেছেন)।
৫। ‘উব্বাদ বিন তামীম রা. থেকে বর্ণিত, আবু বশীর আনছারী রা. বলেন যে, তিনি এক সফরে রাসূলুল্লাহ্‌র সা. সঙ্গী ছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন আবি বকর বলেন, আমার বিশ্বাস, তিনি (আবু বশীর) বলেছেন যে, মানুষ তাদের বাসস্থানে অবস্থান করছিল। এমতাবস্থায়, রাসূল সা. এক লোককে এই বলে পাঠালেন যে , একটি উটের গলায়ও ধনুকের ছিলা অথবা (তাবীজ জাতীয়) বেল্ট রাখবে না, সব কেটে ফেলবে।
ইবনে হাজার রা. ইবনে জাওযীর রা. উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন: ধনুকের ছিলা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে তিনটি রায় রয়েছে। তার মধ্যে একটি হল- তাদের ধারণা অনুযায়ী উটের গলায় ধনুকের ছিলা ঝুলিয়ে দিত, যাতে বদ নজর না লাগে। সুতরাং, উহা কেটে ফেলার উদ্দেশ্যেই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, ধনুকের ছিলা আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে কিছুই করতে পারে না। আর এটা ইমাম মালেকের রা. বর্ণনা। ইবনে হাজর রা. বলেন, মোয়াত্তা মালেকের মধ্যে উক্ত হাদীসের বর্ণনার পরেই ইমাম মালেকের রা. কথাটি এসেছে।
মুসলিম রা. ও আবু দাউদ রা. ইমাম দ্বয়ের কিতাব সমূহে উক্ত হাদীসের পর উল্লেখ করা হয়েছে: মালেক রা. বলেছেন:

أري أن ذلك من أجل العين

অর্থাৎ (আমার মতে, বদ নজর বলতে কোন কিছু নেই বলেই এ আদেশ দেয়া হয়েছে)।
৬। আবু ওয়াহাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন:

وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. (النسائ)

অর্থাৎ ঘোড়াকে বেঁধে রাখ, তার মাথায় ও ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দাও এবং লাগাম পরিয়ে দাও। তবে ধনুকের ছিলা ঝুলিয়ে দিয়ো না। (সুনানে নাসাঈ)।
৭। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের রা. স্ত্রী জায়নব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ্ বাহির থেকে এসে দরজার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে কাশি দিতেন এবং থুতু ফেলতেন, যাতে তিনি এসে আমাদেরকে তার অপছন্দ অবস্থায় না দেখেন। তিনি বললেন, একদিন আব্দুল্লাহ আসলেন এবং কাশি দিলেন। তখন আমার কাছে এক বৃদ্ধা ছিল। সে আমাকে চর্ম রোগের জন্য ঝাড়-ফুক দিচ্ছিল। এ অবস্থায় তাকে আমি খাটের নীচে লুকিয়ে রাখলাম। অতঃপর তিনি ঘরে প্রবেশ করে আমার কাছে এসে বসলেন এবং আমার গলায় তাগা দেখে জিজ্ঞেস করলেন- এই তাগাটা কি? আমি বললাম, এই সুতার মধ্যে আমার জন্য ঝাড়-ফুঁক দেয়া হয়েছে। আমি একথা বলার পর আব্দুল্লাহ তাগাটা কেটে ফেললেন এবং বললেন- আব্দুল্লাহ্‌র পরিবার বর্গ শিরক থেকে মুক্ত। আমি রাসূলুল্লাহ সা. বলতে শূনেছি:

إن الرقي والتمائم والتولة شرك (أحمد ابن ماجة وحاكم)

অর্থাৎ ঝাড়-ফুঁক, তাবীজাবলী এবং ভালোবাসা সৃষ্টির তাবীজ ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে শিরক । (আহমদ, হাকেম, ইবনে মাজাহ) ।

৮। ঈসা বিন আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- আব্দুল্লাহ্ বিন 'ওকাইম রা. অসুস্থ ছিলেন, আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। তাঁকে বলা হল, আপনি কোন তাবীজ কবজ নিলেই তো ভাল হতেন। তিনি বললেন: আমি তাবীজ ব্যবহার করব অথচ এ সম্পর্কে রাসূল সা. বলেছেন:

أتعلق شيئا وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه

(أحمد ابن ماجة وحاكم)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন কিছু রক্ষাকবচ ধারণ করবে, তাকে ঐ জিনিসের কাছে সোপর্দ করা হবে। (আহমদ, হাকেম, ইবনে মাজাহ)

৯। রোআইফা বিন ছাবেত রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন:

عن روفع بن ثابت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أوتقلد وترا أو استنجي برجيع دابة أوعظم فأن محمدا بريئ منه (أحمد نسائي)

অর্থাৎ হে রোআইফা! হয়তো তুমি আমার পরেও অনেক দিন বেঁচে থাকবে। অতএব, লোকদেরকে এ কথা বলে

দেবে যে, যে ব্যক্তি দাড়িতে গিঁট দিল অথবা খেজুরের ডাল লটকাল কিংবা চতুষ্পদ জন্তুর মল বা হাড় দিয়ে ইস্‌তিঞ্জা করল, তার সাথে মুহাম্মদের সা. কোন সম্পর্ক নেই। (আহমাদ, নাসায়ী)

এ সমস্ত হাদীছ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, তাবীজ ব্যবহার করা হারাম এবং শিরক । কারণ, রাসূলের সা. হাদীছ ও ছাহাবায়ে কিরামদের 'আমল দ্বারা তাই সাব্যস্ত হয়। আর তাঁরা রাসূলের সা. হেদায়েত, তাওহীদ পরিপন্থী বিষয়সমূহ এবং যে সমস্ত কাজ তাওহীদকে ত্রুটিপূর্ণ করে দেয়, সেগুলি সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ছিলেন। আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন: তিনি বলেছেন, বালা মুসিবত আসার পূর্বে যা লটকানো হয় তাই তাবীজ। আর বালা-মুছিবতের পরে যা লটকানো হয় তা তাবীযের অন্তর্ভুক্ত নয়।

উল্লেখ্য, এখানে তাবীজ ব্যবহার দ্বারা আয়েশা রা. কুরআনের আয়াত থেকে ব্যবহৃত তাবীজ বুঝাতে চেয়েছেন (ক্কুরআ'নের আয়াত দ্বারা তাবিজ) কতিপয় ইমাম আল্লাহর কালামের তাবীজ ব্যবহার করা জায়েয বলেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে আয়েশা রা. মুসিবত আসার পর কুরআনের আয়াতের তাবীজ ব্যবহার করা জায়েয বলেছেন, কিন্তু মুছিবতের পূর্বেই ইহাও নাজায়েয। কোন কোন আলেমের মতে, অসুস্থ হওয়ার পূর্বে ঝাড়-ফুঁক এবং লোহার ছেঁকা দেয়ার মত চিকিৎসা গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। এ অর্থে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ৭০ হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে

যাবে, তারা হলো ঐ সমস্ত লোক যারা কোন কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না, লোহা পুড়ে ছেক দেয় না, ঝাড়-ফুঁক গ্রহণ করে না, বরং তাদের রবে উপরই তাওয়াক্কুল করে। ইবনে হাজার র. দাউদী এবং অন্য একটি সম্প্রদায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন: হাদীসের অর্থ এই যে, যারা সুস্থ অবস্থায় রোগ হওয়ার ভয় থাকা সত্ত্বেও এসব জিনিস পরিহার করে, আর একথা উপস্থাপন করলাম ইবনে কুতায়বার প্রদত্ত বর্ণনা থেকে। ইবনে আব্দুল বারও এ মত পোষণ করেন।

আয়েশা রা. التمائم দ্বারা ব্যাপকভাবে সকল তাবীজ বুঝাননি (বরং শুধু কুরআনের আয়াতের তাবীজ বুঝানোই তাঁর উদ্দেশ্য) কারণ, অন্যান্য তাবীজাবলী যে রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে ও পরে সর্বাবস্থায় শিরকের অন্তর্ভুক্ত, তা আয়েশার রা. কাছে অজানা ছিল না। (ফাতহুল বারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাবীজ ব্যবহার করা কি বড় শিরক, না ছোট শিরক?

তাবীজ ব্যবহার করা কোন ধরনের শিরক, এ সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে তাবীযের হাক্কীকত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করাকে বেশি সংগত মনে করছি।

অতএব, আল্লাহর নিকট তাওফীক চেয়ে বলছি:

আল্লাহর সাথে শিরক করার অর্থ হল: বান্দা কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে, তার নিকট প্রার্থনা করা, কোন কিছু আশা করা, তাকে ভয় করা, তার উপর ভরসা করা,

কিংবা তার নিকট এমন বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা যায় সমাধান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারে না, অথবা তার নিকট মীমাংসা চাওয়া, অথবা আল্লাহর অবাধ্যতা করে তার আনুগত্য করা, অথবা তার কাছ থেকে শরীয়তের বিধান গ্রহণ করা কিংবা তার জন্য (বা তার নামে) যবাই করা, অথবা তার নামে মানত করা, অথবা তাকে এতটুকু ভালোবাসা যতটুকু আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত। সুতরাং, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সকল কথা, কাজ ও বিশ্বাসকে ওয়াজিব বা মোস্তাহাব রূপে নির্ধারণ করেছেন, সেগুলির সব কিংবা কোন একটি গায়রুল্লাহ্ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্য করাই হল শিরক। এ সম্পর্কে শায়খ ইবনে কাইয়ূম র. যা বলেছেন, তার সারমর্ম নিম্নরূপ:

আল্লাহপাক তাঁর রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন, কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন এবং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যাতে মানব জাতি তাঁর পরিচয় লাভ করতে পারে, তাঁর ইবাদত করে এবং তাঁর একত্ববাদের স্বীকৃতি দিতে থাকে এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর বিধানই যেন বাস্তবায়িত হয়ে যায়। সকল আনুগত্য তাঁর জন্যই নির্ধারিত হয়ে যায় এবং সমস্ত প্রার্থনা যেন তাঁর উদ্দেশ্যই হয়।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, শিরক দুই প্রকার।

প্রথমত: যা আল্লাহর জাত (সত্তা), নাম ও গুণাবলির সাথে সংশ্লিষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ যা তাঁর ইবাদত মুয়ামালাতের সাথে সম্পৃক্ত, যদিও শিরকে লিপ্ত বান্দা মনে মনে এই ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহর জাত, গুণাবলি ও কাজে কোন শরীক বা অংশীদার নেই।

প্রথমোক্ত শিরক আবার দুই প্রকার যেমন:

১। শির্কুত ত্বাতীল

এটাই হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্য শিরক । ফিরআউনের শিরক এই প্রকারের একটি দৃষ্টান্ত। উহা আবার তিন প্রকার। প্রথমতঃ সৃষ্টিকে তার স্রষ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন করা। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর নাম, গুণাবলি ও কার্যাবলীকে অস্বীকার করে মহান স্রষ্টাকে তাঁর পরিপূর্ণতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা। তৃতীয়তঃ আল্লাহর সাথে মুয়ামালাত বা কার্যাবলীর মাধ্যমে অস্বীকার করা, যেগুলি আল্লাহর একত্ববাদে বান্দার উপর স্বীকৃতি দেয়া ওয়াজিব।

২। আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ইলাহ বা মা'বুদ সাব্যস্ত করা

মূলতঃ শিরক হচ্ছে সৃষ্টি ও স্রষ্টা হওয়ার জন্য যেসব গুণাবলি দরকার, সেগুলির ক্ষেত্রে কোন লোক সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে তুলনা বা সাদৃশ্যপূর্ণ করলে, সে মুশরিক হয়ে যাবে। ক্ষতি করা, উপকার করা, দান করা ও দান না করার একক অধিকারী হওয়া ইলাহীর বৈশিষ্ট্য, তথা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। আর এ সব গুণাবলির একক অধিকারী হওয়ার কারণে প্রার্থনা করা ভয় করা, কোন কিছুর আশা করা এবং ভরসা করা কেবলমাত্র তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত হতে পারে। সুতরাং, যদি কোন ব্যক্তি এসব গুণকে কোন মাখলুক বা সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করে, তা হলে সে যেন সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে শরীক করল। আর দুর্বল, নিঃস্ব কোন কিছুকে ক্ষমতাবান, স্বাবলম্বী, স্বয়ং সম্পূর্ণ সত্তার সাথে তুলনা করা খুবই নিকৃষ্ট মানের তুলনা। যে আল্লাহর সাথে সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব জাহির করে এবং তার প্রশংসা করার জন্য, তাকে সম্মান জন্য তার কাছে অবনত হওয়া ও আশা করার জন্য মানুষকে আহ্বান করে, তাহলে ঐ ভয় করা, আশা করা, আশ্রয় প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে মানুষের অন্তরকে তার সাথে সম্পৃক্ত করার কারণে নিশ্চয়ই সে আল্লাহর একত্ববাদ ও প্রভুত্বের ক্ষেত্রে সংঘর্ষে লিপ্ত হল। শিরক হর আল্লাহর প্রতি অতি নিকৃষ্ট একটি ধারণা। সুতরাং, আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোন প্রকার মাধ্যম দাঁড় করানো, তাঁর প্রভুত্ব, রবুবিয়ত ও একত্ববাদের প্রতি চরম আঘাত এবং তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করার শামিল। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য এরূপ ধারণা করাকে কিছুতেই অনুমোদন করেন না। আর স্বাভাবিক জ্ঞান ও নিষ্কলুষ প্রকৃতিও উহাকে পরিত্যাগ করে এবং সুস্থ প্রকৃতি ও উন্নত স্বভাবের নিকট এটা সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় বলে বিবেচিত।

শায়খ মোবারক ইবনে মাইলী বলেছেন- আল্লাহ ওয়া জাল্লা জালালুহু সর্ব প্রকার শিরক এক সাথে উল্লেখ করে বলেন:

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِّ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ

وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ (سباء ٢٢-٢٣)

অর্থাৎ বল: তোমরা আহ্বান কর তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে উপাস্য মনে করতে। তারা আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর অনু পরিমাণও মালিক নয় এবং এত-দু-ভয়ে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ তাঁর সহায়কও নয়। যাকে অনুমতি দেয়া হয়, সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। (সুরা সাবা ২২ও ২৩ আয়াত) এ থেকে বুঝা গেল যে, উপরোক্ত আয়াতে শিরককে চার ভাগে শ্রেণি বিভাগ করত: প্রত্যেক শিরককে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এখন আমরা প্রত্যেক প্রকারের জন্য এমন নাম নির্ধারণ করব, যাতে একটি অপটি হতে আলাদাভাবে চিহ্নিত হয়ে যায়।

شرك الاحتياز (শিরকুল ইহতিয়াজ) অর্থাৎ মালিকানার শিরক। আসমান ও জমিনের মধ্যে অনু পরিমাণ বস্তুর উপরও অন্য কারো মালিকানাকে আল্লাহ বারী তাআলা অস্বীকার করেছেন।

দ্বিতীয়ত: شرك الشياع (শিরকুশ শি'য়া) অর্থাৎ অংশীদারিত্বের শিরক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বীয় রাজত্ব ও মর্যাদার ক্ষেত্রে অপরের সব ধরনের অংশীদারিত্বকে অস্বীকার করেছেন।

তৃতীয়ত: شرك الاعانة (শিরকুল ইয়ানা) অর্থাৎ সাহায্য সহযোগিতার শিরক। আল্লাহ তাআলা তাঁর কাজে অন্য

কারো সাহায্যকারী হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। যেমন, কোন ব্যক্তি বোঝা উঠিয়ে দেয়ার ব্যাপারে অন্যকে সাহায্য করে।

চতুর্থত: شرك الشفاعة (শিরকুশ শাফাআত) অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এমন কারো অস্তিত্বকেও অস্বীকার করেছেন, যে তার মর্যাদার বলে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সুপারিশ করে কাউকে মুক্ত করতে পারে। অর্থাৎ, আল্লাহ কোন প্রকার শিরকই পছন্দ করেন না, তা যত দুর্বল ও সূক্ষ্মই হোক না কেন। তবে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে বিনম্র ভাবে অনুমতি লাভ করে সুপারিশ করতো শিরক হবে না। উল্লেখিত আয়াতে সব ধরনের শিরকের কথাই বলা হয়েছে। কেননা, শিরক হবে হয় প্রভুত্বের ক্ষেত্রে, নতুবা কার্যকলাপের মাধ্যমে। আবার প্রথম প্রকারের শিরক হয় আল্লাহর অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে নিজ অধিকারভুক্ত করে নিবে, অথবা তার অংশ যৌথভাবে বহাল থাকবে। এমনিভাবে দ্বিতীয় প্রকারের শিরক প্রভুর জন্য সাহায্যকারী হবে, অথবা প্রভুর নিকট অন্য কারো জন্য সাহায্যকারী হবে। এই চার প্রকার শিরকের কথাই উক্ত আয়াতে ধারাবাহিক ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত আয়াতের অনুসরণে শিরকের প্রকার সমূহের এরূপ আলোচনা আল্লামা ইবনুল কাইউম র. ব্যতীত, আমার জানা মতে অন্য কেউই করেননি। ইবনুল কাইউম রা. এই চারটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা ঐ সকল মাধ্যমকে, মুশরিকরা যেগুলি অবলম্বন করেছিল,

সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করে দিয়েছেন। বস্তুত: যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অপর কাউকে অভিভাবক অথবা সুপারিশকারী হিসাবে গ্রহণ করেছে, তার দৃষ্টান্ত হল মাকড়সার ঘর বানানোর ন্যায়, আর মাকড়সার ঘর হচ্ছে সব চেয়ে দুর্বল ঘর।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ (سباء ٢٢-٢٣)

অর্থাৎ বল: তোমরা আহ্বান কর তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে উপাস্য মনে করতে। তারা আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর অনু পরিমাণও মালিক নয় এবং এত দু ভয়ে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ তাঁর সহায়কও নয়। যাকে অনুমতি দেয়া হয়, সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। (সুরা সাবা ২২ও ২৩ আয়াত)

মুশরিকরা যখন কারো নিকট থেকে কোন প্রকার উপকার পাওয়ার আশা করে কেবল তখনই সে তাকে মা'বুদ বা উপাস্য রূপে গ্রহণ করে নেয়। আর বলা বাহুল্য যে, উপকার একমাত্র তার কাছ থেকেই পাওয়া যায়, যার মধ্যে এই চারটি গুণের একটি হলেও বিদ্যমান আছে। গুণগুলি হল: (১) উপাসনাকারী যে জিনিসের আশা করে তার মালিক হওয়া। (২) মালিক না হলে, মালিকের অংশীদার হওয়া। (৩) অংশীদারও না হলে, সে জিনিসের ব্যাপারে মালিকের সাহায্যকারী হওয়া এবং (৪) সাহায্যকারীও না হলে,অন্তত: পক্ষে মালিকের কাছে কারো সম্পর্কে সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখা।

সুতরাং, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উক্ত আয়াতে শিরকের এই চারটি স্তরকে ধারাবাহিক ভাবে অস্বীকার করেছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর সার্বভৌমত্ব ও রাজত্বে অন্য কারো মালিকানা, অংশীদারিত্ব, সাহায্য সহায়তা এবং তাঁর কাছে সুপারিশের ক্ষমতা বিন্দুমাত্রও নেই। তবে, আল্লাহ যে সুপারিশ সাব্যস্ত করেছেন, সেটা তাঁর অনুমতিক্রমে হয় বলে তাতে মুশরিকদের জন্য কোন অংশ বা সুবিধা নেই।

শায়খ মাইলী র. সম্ভবত: আল্লামা ইবনুল কাইয়ূমের রা. এই উক্তি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তদুপরি তার উক্তি উবনুল কাইয়ূমের উক্তির প্রায় কাছাকাছি। এতে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে ফিকাহ শাস্ত্রবিদদের অভিন্ন মতের পাওয়া যায়। আবার আবুল বাকা যুফী র. তার কুল্লিয়াত নামক কিতাবে শিরককে ছয় ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা:

১। شرك الاستقلال (শিরকুল ইসতিকলাল) দুজন ভিন্ন ভিন্ন শরীক সাব্যস্ত করাকে শিরকুল ইসতিকলাল বলা হয়। যেমন, মূর্তি পূজা করা করে থাকে।

২। شرك التبعيض (শিরকুত তাবঈদ) একাধিক মা'বুদের সমন্বয়ে এক মা'বুদ হওয়ার বিশ্বাসকে শিরকুত তাবঈদ বলা হয়। যেমন, নাছারাদের শিরক।

৩। شرك التقرير (শিরকুত তাকরীর) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদের ইবাদত করা যাতে তারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে তাকে সহায়তা করে। যেমন, প্রাচীনকালের লোকদের শিরক অর্থাৎ জাহেলী যুগের শিরক।

৪। شرك التقليد (শিরকুত তাকলীদ) অন্যদের অনুসরণ করে গাইরুল্লাহর ইবাদত করাকে শিরকুত তাকলীদ বলা হয়।যেমন, জাহেলী মধ্য যুগের শিরক।

৫। شرك الاسباب (শিরকুল আসবাব্) ক্রিয়ার প্রভাবকে সাধারণ মাধ্যম সমূহের সাথে সার্বিক ভাবে সম্পৃক্ত করাকে শিরকুল আসবাব্ বলা হয়। যেমন, দার্শনিক, জড়বাদী এবং তাদের অনুসারীদের শিরক।

৬। شرك الاغراض (শিরকুল আগরাদ) গাইরুল্লাহর জন্য কোন কাজ করাকেই শিরকুল আগরাদ বলা হয়। লেখক বলেন, আমার মতে এখানে অনেক ধরনের শিরক আছে যেগুলি আল্লামা কাফাবী র. স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেননি। তবে, সেগুলি তাঁর নির্দেশিত মৌলনীতির আওতায় এসে যায়। যথা: শিরকুত তা'আও অর্থাৎ ইবাদতের শিরক। এটা শিরকের ক্ষেত্রে মৌলনীতি। এই মৌলনীতির আওতায় অনেক প্রকার শিরক এসে যায়। যেমন: ইয়াহুদী এবং নাছারাদের শিরক। তারা আল্লাহর তোয়াক্কা না করে হালাল-হারামের উৎস মনে করে তাদের ধর্ম যাজকদেরকে। এরূপ হারামকে হালাল মনে করার শিরক, আল্লাহর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার শিরক, আল্লাহর বিধান অস্বীকার

করার শিরক, মুনাফিকীর শিরক এবং গাইরুল্লাহকে ভালবাসার শিরক। এ সকল শিরক, মনোবৃত্তি, মনোবাসনা, কুপ্রবৃত্তি এবং শয়তানের ইবাদত করায় যে শিরক হয়, তার আওতায় এসে যায়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿الجاثية٢٣﴾

অর্থাৎ তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছ, যে তার খেয়াল-খুশিতে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে-শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন। তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তা ভাবনা করো না। (সুরা জাসিয়া, ২৩ আয়াত)

অন্যত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿يس٦٠﴾

অর্থাৎ হে আদম,সন্তান! আমি কি তোমাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করিনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করবে না? নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সূরা য়াসীন ৬০ আয়াত

শিরক দুই প্রকার। যথা: আকবর অর্থাৎ বড় শিরক এবং আছগর অর্থাৎ শেরক দুই প্রকার। যথা: আকবর অর্থাৎ বড়

শিরক এবং আছগর অর্থাৎ ছোট শিরক। দুনিয়া এবং আখেরাতের দিক দিয়ে এই দুই প্রকার শিরকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন- বড় শিরকে যে ব্যক্তি লিপ্ত হবে তাকে দুনিয়াতে ধর্ম বিচ্যুতির দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং তার যাবতীয় আদান প্রদান ও লেন-দেনের ব্যাপারে মূরতাদের (ধর্ম বিচ্যুত লোক) বিধি বিধান প্রযোজ্য হবে। ফিকাহ শাস্ত্রের কিতাবসমূহে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বলেন:

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿الفرقان٢٣﴾

অর্থাৎ আর আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকনা রূপ করে দেব। (সূরা ফুরকান, ২৩ আয়াত।)

আর আখিরাতে তার শাস্তি হচ্ছে, সে চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। কারণ, শিরকের অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করেন না।

আল্লাহ ওয়া জাল্লা শানুহু কুর'আনে এরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴿٤٨النساء﴾

অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না, ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। (সূরা নিসা ৪৮ আয়াত।)

তবে শিরকে আছগর তথা ছোট শিরক জঘন্য হলেও, তার হুকুম বড় শিরক থেকে ভিন্নতর। ছাহাবায়ে কিরাম রা. থেকে বর্ণিত আছে, ছোট শিরক হচ্ছে কবিরা গুনাহ সমূহের মধ্যে সর্বাধিক জঘন্য। তবে হ্যাঁ, এটা জঘন্য হলেও বড়

শিরকের সমকক্ষ নয়। তার চেয়ে অনেক নিম্নে। এখন কথা হচ্ছে, আমরা কীভাবে উভয় শিরকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করব এবং সহজেই এই ফয়সালা করতে পারব যে, তাবীজ ব্যবহার কোন ধরনের শিরক?

উল্লেখ্য যে, রছোট শিরক ও বড় শিরকের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য অনেক নীতিমালা রয়েছে। যেমন:

১। বাক্যের শব্দাবলিতে শিরকী অর্থ বিদ্যমান, কিন্তু উক্তিকারী বাক্য দ্বারা গাইরুল্লাহর জন্য কোন প্রকার ইবাদত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে করেনি। এমতাবস্থায়, এ ধরনের বাক্য উচ্চারণ তথা ব্যবহার করা হবে ছোট শিরক। এ প্রসঙ্গে রাসূল সা. এমন এক ব্যক্তিকে লক্ষ করে এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রাসূলকে সা. বলেছেন:

لمن قال له ماشاءالله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ماشاءالله وحده

(أحمد)

অর্থাৎ (আল্লাহ এবং আপনি যা ইচ্ছা করেছেন) রাসূল সা. বলেছেন: তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে ফেললে? এ ভাবে না বলে তোমার উচিত শুধু আল্লাহ যা চেয়েছেন বলা। (আহমদ)

অন্য একটি হাদীসে এসেছে-

لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان

(أحمد)

অর্থাৎ রাসূল সা. এরশাদ করেছেন: তোমরা এ রকম কথা বলো না, আল্লাহ এবং অমুক লোক যা ইচ্ছা করেছেন, বরং

বলবে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন, অতঃপর অমুক যা ইচ্ছা করেছেন'। (মুসনাদে আহমদ)
ছাহাবায়ে কেরামগণ রা. বলেছেন: শব্দ বা বাক্যের শিরক হচ্ছে অপ্রকাশ্য শিরক এবং ওটা ছোট শিরক।

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿البقرة٢٢﴾

অর্থাৎ জেনে শুনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না। (সুরা বাকারাহ, ২২ আয়াত)
এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন: আন্দাদ অর্থ হচ্ছে এমন শিরক, যা রাতের অন্ধকারে মসৃণ কালো পাথরের উপর পিঁপড়ার চলাচলের চেয়েও অধিক গোপন। এই শিরকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন তুমি কাউকে বলে বসলে যে, হে অমুক! আল্লাহ এবং তোমার জীবনের শপথ, অথবা বলল: এই কুকুর না হলে আমাদের ঘরে চোর প্রবেশ করত, এই হাঁস বাড়িতে না থাকলে ঘরে চোর আসত, কিংবা একজন আর একজনকে বলল, আল্লাহ এবং আপনার ইচ্ছায়'। এভাবে কেউ বলল, আল্লাহ এবং অমুক না হলে সে কিছুই করতে পারত না' এ ধরনের সব কথাই হচ্ছে শিরক। অনুরূপভাবে উক্ত আয়াতের তাফসীরে আকরামা রা. বলেছেন, তার উদাহরণ হল আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নাম নিয়ে শপথ করা।
রাসূল সা. বলেছেন:

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (أحمد)

অর্থাৎ যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর শপথ করল, সে কাফির হয়ে গেল অথবা মুশরিক হয়ে গেল। (আহমদ)

এই হাদীসে শিরক বা কুফর দ্বারা ছোট শিরক বুঝানোই উদ্দেশ্য, যেমন ইবনে আব্বাসের রা. হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যা আগে উল্লেখিত হয়েছে। এভাবে কাউকে গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাস বানানো, যথা: আব্দুল হাসান (হাসানের গোলাম), আব্দুল হোসাইন (হোসাইনের গোলাম), গোলাম রাসূল (রাসূলের গোলাম) ইত্যাদি। এ ধরনের নাম রেখে গাইরুল্লাহর সাথে দাসত্বের সম্পর্ক করাও শিরক।
২। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শিরক বিদ্যমান থাকা (অর্থাৎ ব্যক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পুর্ণরূপে শিরকী ভাবধারায় প্রভাবিত হওয়া) যেমন, এমন কোন লোক ভাল ও পুণ্য কাজ করল, যার অন্তরে ঈমান নেই অথবা শুধু পার্থিব স্বার্থ এবং ইহকালীন জীবনের লক্ষেই কেউ তার কর্ম তৎপরতা পরিচালিত করে। এরূপ অবস্থায় এটা হবে বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত।
আল্লাহপাক পবিত্র কালামে এরশাদ করেন:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿هود١٦﴾

অর্থাৎ যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে, তাহলে দুনিয়ায় আমি তাদের কর্মের ফল দান করি এবং সেথায় তাদের কম দেয়া হবে না, তাদের জন্য

পরকালে অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করে, আখিরাতে তা নিষ্ফল হবে এবং তারা যা করে থাকে তা নিরর্থক। (সূরা হুদ ১৫ ও ১৬ আয়াত)

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছোট শিরকও বিদ্যমান থাকতে পারে। যথা: কোন মুসল্লী তার ছালাতকে এ জন্যই ঠিক মত এবং সুন্দর ভাবে আদায় করছে যে, তাকে কোন লোক লক্ষ্য করে দেখছে।

রাসূল সা. বলেছেন: এরূপ করা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। হাদীছ শরীফে এসেছে: জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল সা. বের হলেন, অতঃপর বললেন:

أيها الناس إياكم و شرك السرائر قالوا يا رسول الله ما شرك السرائر قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يري من نظرالناس إليه فذاك شرك السرائر (البيهقي ابن خزيمة)

অর্থাৎ হে লোক সকল! তোমরা গোপন শিরক থেকে দুরে থেকো। ছাহাবাগণ রা. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সা. গোপন শিরক কি? তিনি বললেন, কোন লোক ছালাত আদায় করার জন্য দাঁড়ায়, আর অত্যন্ত সুন্দর ভাবে ছালাত আদায় করে। কারণ, তার প্রতি মানুষ লক্ষ্য করছে। এটাই হল গোপন শিরক। (সুনানে বায়হাকী ও ইবনে খুযায়মা)। যায়েদ বিন আসলাম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর রা. একদিন মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলেন, আর মা'আজ বিন জাবালকে রা. রাসূলুল্লাহর সা. কবরের কাছে ক্রন্দনরত

অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি বললেন: হে মা'আজ! তোমাকে কোন জিনিস কাঁদাচ্ছে? মা'আজ রা বললেন- সে হাদীছটি আমাকে কাঁদাচ্ছে, যেটা রাসূলকে সা. আমি বলতে শুনেছি: সামান্যতম রিয়াও (অর্থাৎ লোক দেখানো) শিরক, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওলীদের সাথে শত্রুতা করে সে যেন আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ সমস্ত লোকদেরকে ভালোবাসেন যারা পুণ্যবান, পরহেজগার এবং অপরিচিত, যারা অনুপস্থিত থাকলে কেউ তাদের চিনে না। তাদের অন্তর হেদায়েতের প্রদীপ। তারা বের হয়, এ অন্ধকার ধুলাময় স্থান থেকে। (হাকেম ও ইবনে মাজাহ)

ইমাম আবুল বাকা কাফাবী বর্ণনা করেছেন যে, এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করা হয়েছে যে, এ ধরনের ছোট শিরকে লিপ্ত লোককে এমন কাফের বলা যাবে না, যে, ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়। শিরকের আর একটি ধরন হল দুনিয়ার উদ্দেশ্যে কোন কাজ কিংবা আমল করা, তাহলো দুনিয়া তার একক অথবা একমাত্র উদ্দেশ্য নয় বরং দুনিয়ার সাথে সাথে সে আখেরাতের প্রতিদানও চায়। যেমন, কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় সুনাম এবং আখিরাতে প্রতিদান পাওয়ার আশায় জিহাদ করেছে অথবা জিহাদে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়ার সম্পদ ও আখিরাতে প্রতিদান পাওয়া।

রাসূল সা. এরশাদ করেছেন:

تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي إن لم يعط سخط الحديث (بخاري)

অর্থাৎ ধ্বংস হোক দিনারের গোলাম, ধ্বংস হোক দিরহামের গোলাম, ধ্বংস হোক ক্ষুধার গোলাম, ধ্বংস হোক পোশাকের গোলাম। যদি দেয়া হয় তো সন্তুষ্ট হয়, আর যদি না দেয়া হয় তাহলে অসন্তুষ্ট হয়। (বুখারী কিতাবুল জিহাদ অধ্যায় ।৭০)

আর যদি কোন লোক একবারেই ছওয়াবের নিয়ত না করে শুধুমাত্র দুনিয়া অর্জন করার উদ্দেশ্যেই কোন আমল করে, তাহলে তা হবে বড় শিরক, যার দৃষ্টান্ত পূর্বেও উল্লেখিত হয়েছে। যেমন, কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র সম্পদ লাভের আশায় ছালাত আদায় করে কিংবা কালিমা শাহাদাত মুখে উচ্চারণ করে।

৩। আসবাব বা মাধ্যম সম্পর্কিত শিরক: যেমন, কোন ব্যক্তি মাধ্যমের উপর ভরসা করে, অথচ উহা প্রকৃতপক্ষে মাধ্যম নয় এবং শরীয়াতের দৃষ্টিতেও মাধ্যম নয়। এমনি ভাবে মানুষের বুদ্ধি বিবেচনায়ও মাধ্যম নয়। এ ধরনের শিরক একটি শর্ত সাপেক্ষে ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। শর্ত হল, মাধ্যমের উপর পরিপূর্ণ ভাবে ভরসা না করা। অর্থাৎ, সে যেন এই ধারণা পোষণ না করে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকেই এই মাধ্যম একক ভাবে প্রভাব সৃষ্টিকারী, অথবা যাকে সে মাধ্যম মনে করে, তার উদ্দেশ্য কিছু ইবাদতও করে। (শর্তে বর্ণিত দুটি অবস্থায় বড় শিরক হবে)। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের রা. নিম্ন বর্ণনা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়:

الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل (أحمد أبو داؤد و حاكم)

অর্থাৎ পাখি উড়িয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করা শিরক, পাখি উড়িয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করা শিরক। আমরা প্রত্যেকেই বিপদগ্রস্ত হতে পারি, কিন্তু আল্লাহ তাওয়াক্কুলের কারণে আমাদেরকে বিপদমুক্ত করেন) (আহমদ, আবু দাউদ ও হাকেম)

এমনি ভাবে আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. হতে বর্ণিত হাদীছ থেকেও তা বুঝা যায়। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك يا رسول الله قال: إن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك (أحمد)

অর্থাৎ রাসূল সা. এরশাদ করেছেন, তিয়ারা (পাখি উড়িয়ে ভাগ্য নির্ধারন করণ) যে ব্যক্তিকে তার প্রয়োজনীয় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখল সে বস্তুত: শিরক করল। ছাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ওর কাফফারা কি? রাসূল সা. বললেন: একথা বলা যে, হে আল্লাহ! তোমার কল্যাণ ব্যতীত আর কারো কল্যাণ নেই, তোমার তিয়ারা ব্যতীত আর কারো তিয়ারা নেই, এবং তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। (আহমদ)

শায়খ আব্দুর রহমান বিন সাদী বলেন- যে সকল কথা ও কাজ মানুষকে শিরক পর্যন্ত পৌঁছায়, তাকে ছোট শিরক বলে। যেমন: কোন মাখলুক বা সৃষ্টির ব্যাপারে এতখানি বাড়াবাড়ি করা যে, তার ইবাদত করা শুরু হয়ে যায়, অথচ

সৃষ্টি কখনও ইবাদতের উপযুক্ত হতে পারে না। যথা: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা এবং সামান্য রিয়া প্রকাশ করা ইত্যাদি। উপরোক্ত আলোচনা হতে এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ছোট শিরক মূল ঈমানের কোন ক্ষতি সাধন করে না এবং সম্পূর্ণরূপে গাইরুল্লাহর ইবাদত পর্যন্ত পোঁছিয়ে দেয় না। একাধিক দলীল দ্বারা ছোট শিরকের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। প্রথমত: রাসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক কোন নির্দিষ্ট কাজকে ছোট শিরক বলে আখ্যায়িত করা। যেমন:

রাসূল সা. বলেছেন:

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الاصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الاصغر قال الرياء (أحمد)

অর্থাৎ তোমাদের জন্য যে বিষয়টিকে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় করি, তা হল ছোট শিরক। ছাহাবাগণ রা. বললেন- হে আল্লাহর রাসূল সা. ছোট শিরক কি?

উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানো আমল। (আহমদ)

দ্বিতীয়ত: কোন কাজকে শিরক বা কুফর আখ্যায়িত করে শরীয়তে তার জন্য মুরতাদের শাস্তি অপেক্ষা নিম্নতর শাস্তির বিধান করা, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ কাজটি ধর্ম বিচ্যুতির ন্যায় কুফর। বরং উহা ছোট শিরক এবং কুফরের মিলিত অপরাধ। যেমন, কোন মুসলিমকে হত্যা করা।

মুসলিম হত্যাকে রাসূল সা. কুফর বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর শরীয়তে মুসলিম হত্যাকারীর শাস্তি হল

কিছাছ। কিন্তু নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা হত্যাকারীকে ক্ষমাও করে দিতে পারে, অথবা ইচ্ছা করলে দিয়ত বা রক্তপণও নিতে পারে। পক্ষান্তরে, যে মুরতাদ পুনরায় ইসলামে ফিরে না আসে, তার শাস্তি (মৃত্যুদণ্ড) কোন অবস্থাতেই ক্ষমা করা যায় না। এক মুসলিম অপর মুসলিমকে হত্যা করা কুফরী হলেও আল্লাহ তাদেরকে পরস্পর ভাই হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু একজন মুরতাদকে মুসলিমের ঈমানী ভাই বলে আখ্যায়িত করা নাজায়েয।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লা জালালুহু বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿الحجرات١٠﴾

অর্থাৎ নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই। সুতরাং, তোমরা তোমাদের ভাইদের মাঝে (সম্পর্ক) সংশোধন করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। সম্ভবত[১] তোমাদের প্রতি রহম করা হবে। (সূরা হুজুরাত ১০ আয়াত)

তৃতীয়ত: ছাহাবী কর্তৃক কোন কাজ শিরক বলে আখ্যায়িত করা অথবা কুরআন ও হাদীসের আলোকে বুঝা যে, ঐ কাজটি ছোট শিরক। যেহেতু রাসূল সা. ছাহাবাদের রা. কাছে আকীদাহ্ সম্পর্কে এমন বিস্তারিত আলোচনা করে গেছেন যে, তাদের নিকট অন্য কিছুর সাথে শিরকের

[১] আল্লাহ গাফুরুর রাহীমের তরফ হতে সম্বভত অর্থ হচ্ছে অবশ্যই।

সংমিশ্রণ হত না। অতএব, এ বিষয়ে যে কোন ছাহাবীর রা. কথাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

তা,বিজ ব্যবহার করা ছোট শিরক, না বড় শিরক?

তাবীজ ব্যবহার করা শিরকুল আসবাব-এর অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের শিরক শিরককারীর মনের অবস্থা ও তার ধ্যান ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে কখনো বড় শিরক, আবার কখনো ছোট শিরক হয়ে যায়। সুতরাং, তা,বিজ ব্যবহার করাকে সাধারণভাবে বড় শিরক বা ছোট শিরক বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। বরং তা,বিজ ও তা,বিজ ব্যবহারকারীর প্রতি লক্ষ্য করতে হবে। তা,বিজ যদি কোন মূর্তির ছবি হয়, অথবা এমন শিরকী মন্ত্র তা,বিজে লেখা থাকে, যেগুলির মাধ্যমে গাইরুল্লাহর কাছে শিফার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে, তা হলে নিঃসন্দেহে উহা বড় শিরক।

এভাবে যদি কেউ কড়ি বা সুতা ইত্যাদি গলায় ধারণ করে এবং এ ধারণা পোষণ করে যে, ঐ গুলি বালা-মুসিবত দূর করার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখে, তাহলে উহাও বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি এ ধরনের ধ্যান-ধারণা না হয়, তাহলে ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে

আমরা এখন এ সম্পর্কে কয়েকজন ইসলামী ব্যক্তিত্বের কিছু উক্তি বর্ণনা করছি।

শায়খ আব্দুর রহমান বিন সাদী, শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব রচিত "কিতাবুত তাওহীদ" এর উদ্ধৃতি দিয়ে

লুবাব নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, বালা-মুসিবত দুর করার জন্য কিংবা বালা-মুসিবত থেকে হিফাযতে থাকার জন্য চুড়ি, তাগা ইত্যাদি পরিধান করা শিরক। এ বিষয়টি পুরাপুরিভাবে বুঝতে হলে আসবাব বা মাধ্যমের হুকুম সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ হল এই যে, বান্দার আসবাব বা মাধ্যম সম্পর্কে তিনটি ধারণা থাকতেই হবে।

১। কোন জিনিসকে সবব বা মাধ্যম মনে না করা,যতক্ষণ পর্যন্ত উহার পক্ষে শরয়ী প্রমাণ না পাওয়া যায়।

২। কোন বান্দা মাধ্যমের উপর ভরসা করবে না, বরং যিনি মাধ্যম হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উপরই ভরসা করবে এবং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ওটা ব্যবহার করবে ও আল্লাহ চাইলে উপকৃত হওয়ার আশা রাখবে।

৩। এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, মাধ্যম যত বড় ও শক্তিশালীই হোক না কেন, উহা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নির্দেশের আজ্ঞাবহ এবং তাঁর ফয়সালা ও তাকদীরের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এখান থেকে বের হওয়ার কোন ক্ষমতাই তার নেই। আরো বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ যেভাবে চান সেভাবেই উহার মধ্যে তাছাররুফ করেন। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর হিকমত অনুসারে উহার সবব হওয়ার গুণকে বহাল রাখেন, যাতে বান্দা উহা ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারে এবং তাতে নিহিত আল্লাহর হিকমতকে পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, তিনি মাধ্যমকে ইহার ক্রিয়া ও প্রভাবের সাথে কি সুন্দরভাবে সম্পৃক্ত

করেছেন। আবার তিনি ইচ্ছা করলে মাধ্যম হওয়ার গুণকে পরিবর্তন করে দিতে পারেন যাতে বান্দা উহার উপর সম্পূর্ণরূপে ভরসা না করতে পারে, আল্লাহর কুদরতের পরিপূর্ণতা সম্পর্কে অবগত হতে পারে এবং জানতে পারে যে, সার্বভৌম ক্ষমতা ও চূড়ান্ত ফয়সালার মালিক একমাত্র আল্লাহই। সব ধরনের আসবাব তথা মাধ্যম সম্পর্কে চিন্তা ও ব্যবহারে বান্দার উপরোক্ত ধারণা থাকা আবশ্যক তথা ফরয। একথা জানার পর ইহা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যদি কেই মুছীবত আসার পরে উহা দুর করার জন্য অথবা মুসিবত আসার পূর্বে উহা প্রতিহত করার জন্য ত'বিজাবলী বা সুতা ইত্যাদি ব্যবহার করে, তাহলে তা শিরক হবে। কেননা, স যদি এই ধারণা পোষণ করে যে, উহাই মুসিবত দুর করে বা প্রতিহত করে, তাহলে উহা হবে বড় শিরক।

যেহেতু, সে সৃষ্টি এবং পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করেছে, তাই এটা হবে আল্লাহর একত্ববাদের সাথে শরীক করা। আর, যেহেতু সে উহাকে উপকারের মালিক মনে করে তার কাছে আশ্রয় চেয়েছে এবং এ আশায় অন্তরকে তার সাথে সম্পৃক্ত করেছে, তখন ইহা হবে ইবাদতের মাধ্যমে শরীক করা। অন্যদিকে, যদি এই ধারণা পোষণ করে যে, মুসিবত দুর করার ও প্রতিহত করার মালিক একমাত্র আল্লাহই কিন্তু তাবীজাবলী বা সুতা ইত্যাদিকে সে এমন সবব মনে করে, যার দ্বারা মুসিবত দূর করা যায়, তাহলে প্রকৃত পক্ষে সে এমন বস্তুকে সবব ধারণা করল যা শরীয়তের দৃষ্টিতে এবং প্রাকৃতিকভাবে সবব নয়।

তাই এটা শরীয়ত ও প্রকৃতির উপর একটি মিথ্যা অপবাদ। কেননা, শরীয়ত এ থেকে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছে, আর যে বিষয়ে নিষেধ আছে সেটা কোন উপকারী সবব বা মাধ্যম হতে পারে না এবং প্রাকৃতিকভাবে এটা এমন কোন নিশ্চিত বা অনিশ্চিত মাধ্যম নয় যার দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। অনুরূপভাবে এটা কোন বৈধ উপকারী ঔষধও নয়। অধিকন্তু উহা শিরকের মাধ্যম সমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, ব্যবহারকারী অবশ্যই তার অন্তরকে উহার সাথে সম্পৃক্ত করে। আর ইহা এক ধরনের শিরক বা শিরকের মাধ্যম।

তাবীজ ঐ সমস্ত জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলির সাথে ব্যবহারকারীদের অন্তর ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। তাই ঐ নিয়তে কোন কিছু গলায় ঝোলানো তাবীযেরও একই হুকুম। এভাবে উহার কোনটি বড় শিরক আবার কোনটি ছোট শিরক। বড় শিরক যেমনঃ ঐ সমস্ত তাবীজ, যার মধ্যে শয়তান অথবা অন্য কোন সৃষ্ট জীবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। আর যে সকল বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সাহায্য করতে পারে না, সেগুলির ব্যাপারে গাইরুল্লহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক। ইনশাআল্লাহ্ এ বিষয়ে একটু পরেই আলোচনা আসছে। আর ছোট শিরক ও হারাম হওয়ার দৃষ্টান্ত হল ঐ সকল তাবীজ, যেগুলিতে এমন সব নাম থাকে, যেগুলোর অর্থ বুঝা যায় না এবং যেগুলি শিরকের দিকে নিয়ে যায়।

শায়খ সুলায়মান বিন আব্দুল্লাহ্ বিন শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব র. এরূপই বলেছেন যে, এখানে উদ্দেশ্য হল মুসিবত দূর করা বা প্রতিহত করার জন্য তামা, লোহা বা অনুরূপ কোন ধাতব বস্তু ব্যবহার করা। এর হুকুমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উহা শিরকে তা'তীলের অন্তর্ভুক্ত। মহান ও পবিত্র আল্লাহর একমাত্র ইলাহ বলতে ঐ সত্তাকে বুঝায়, যার প্রতি হৃদয় আসক্ত হয় এবং যার নিকট এমন বিষয়ের আশা রাখে ও আশ্রয় প্রার্থনা করে যা শুধু সর্ব শক্তিমান আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত এবং সকল আনুগত্য, সকল ইবাদত আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট। ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইবাদত হচ্ছে-আল্লাহর কাছে দ'আ করা, তাঁর কাছে আশা করা, তাঁর উপর তাওয়াক্কুল রাখা এবং বিশ্বাস করা যে, ভাল-মন্দ একমাত্র তাঁরই হাতে। শুধু তিনিই ভাল-মন্দ আনয়নকারী ও প্রতিহতকারী।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ

(يونس١٠٧)

অর্থাৎ আর আল্লাহ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন তাহলে তিনি ছাড়া কেউ নেই তা খণ্ডানোর মত। পক্ষান্তরে, যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তাহলে তার মেহেরবাণীকে রহিত করার মতও কেউ নেই। (সুরা য়ুনুস ১০৭ আয়াত)

সুতরাং, যদি কেউ বিশ্বাস রাখে যে, গিড়া, তাগা পরিধান করলে এবং হাঁড় ও তাবীজ ধারণ করলে বালা-মুসিবত ও

দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যায়, তবে সে এ ধরনের বিশ্বাসের কারণে শিরক করল এবং আল্লাহর কাজকে বাতিল করে দিল, যেটা নির্দিষ্ট রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে একমাত্র স্রষ্টার জন্য। এভাবে সে ঐ কাজকে تميمة এর জন্য সাব্যস্ত করে, যেটাকে যথাস্থানে মর্যাদা দেয়ার পরিবর্তে অন্যকে মর্যাদা দিল। এজন্যই নবী করীম সা. বাহুতে তামার চুড়ি ব্যবহারকারী ব্যক্তিকে বলেছেন উহা খুলে ফেলতে। কারণ, উহা কেবল দুর্বলতাই বাড়িয়ে দেবে। উহা সাথে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে কখনও সফল হতে পারবে না। ইমাম আহমদ র. ইমরান বিন হোসাইনের সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীসের এই অংশ ما أفلحت أبدا "তুমি কখনও সফল হতে পারবে না" দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ইহা বড় শিরক, যা ক্ষমার অযোগ্য, এমনকি ইহার কারণে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

শায়খ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ شرح كتاب التوحيد এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ تيسير العزيزالحميد নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, বালা-মুসিবত দূর করার উদ্দেশ্যে গিড়া, তাগা পরিধান করা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এখানে মনে রাখা দরকার যে, উক্ত কথা দ্বারা শায়খের উদ্দেশ্য হলো এই যে, ঐ সমস্ত তাবীজকে শুধু মাধ্যম মনে করে ব্যবহার করলে তা ছোট শিরক হবে। আর যদি ওগুলির উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে, সেগুলির নিকট থেকে উপকারের আশা করে এবং সেগুলির

সাথে এমন ব্যবহার করে, যেমন ব্যবহার আল্লাহর সাথে করা উচিত, অথবা তাবীজ যদি শিরকী হয়, যেমন তাতে সৃষ্টির কাছে এমন ব্যাপারে সাহায্য চাওয়া হয়েছে, যে সাহায্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না, তা হলে ওটা নিঃসন্দেহে বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে। تيسير العزيزالحميد এবং التوضيح عن توحيد الخلائق গ্রন্থ দ্বয়ে শায়খের আলোচনার সমষ্টি থেকে স্পষ্টভাবে উক্ত কথাই প্রতীয়মান হয়। অনুরূপ কথা শায়খ আব্দুল আযীয বিন বাজও বলেছেন। তিনি বলেছেন- শয়তানের নাম, হাড়, পূতি, পেরেক অথবা তিলিস্মা (অর্থাৎ অর্থবিহীন বিদঘুটে শব্দ বা অক্ষর) প্রভৃতি বস্তু দিয়ে তাবীজ বানানো হলে সেটা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে। অনেক সময় উল্লেখিত বস্তু সমূহের তাবীজ ব্যবহারকারী বিশ্বাস করল যে, এই তাবীজ আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই তাকে হিফাযত করবে বা তার রোগ-ব্যাধি দূর করে দেবে অথবা তার দুঃখ-কষ্ট অপসারিত করবে। فتح المجيد গ্রন্থের উপর خامد الفقي কর্তৃক লিখিত হাশিয়া-এর টীকা লিখতে গিয়ে শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায বলেছেন:

তাবীজ ব্যবহার করায় দ্বীনের সাথে বিদ্রূপ করা হয় না, বরঞ্চ সেটা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত এবং জাহেলিয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবার অনেক সময় তাবীজ ব্যবহারকারীর ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে বড় শিরকের অন্ত র্ভুক্তও হয়ে যায়। যথা: এরূপ ধারণা পোষণ করা যে,

আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই উহা উপকার ও ক্ষতি করে। কিন্তু যদি এরূপ ধারণা পোষণ করা হয় যে, উহা বদ নজর অথবা জিন ইত্যাদি থেকে হিফাযতে থাকার একটি মাধ্যম, তবে ইহা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, আল্লাহ তাবীজকে মাধ্যম হিসাবে সৃষ্টি করেন নি। বরঞ্চ উহা থেকে নিষেধ করেছেন, উহার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং সেটাকে রাসূলের সা. ভাষায় শিরক বলে ঘোষণা করেছেন। কারণ, ব্যবহারকারীর অন্তর আল্লাহ থেকে বিমুখ হয়ে তাবীযের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং উহার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, এভাবে শিরকের দরজা খুলে যায়।

শায়খ হাফেজ হাকামী বলেন:

وإن تكن مما سوي الوحيين* فانها شرك بغير مين بل إنها قسيمة

ألأزلام* في البعد عن سيما أو لى الاسلام

অর্থাৎ দুই ওহি তথা আল কুরআন ও আল হাদীছ ব্যতীত, ইয়াহুদীদের তিলিসমাতি, মূর্তি পূজারি, নক্ষত্র পূজারি, মালাইকা পূজারি এবং জিনের খিদমত গ্রহণকারী ইত্যাদি বাতিল পন্থীদের তাবীজ ব্যবহার; অনুরূপভাবে পূতি, ধনুকের ছিলা, তাগা এবং লোহার ধাতব চুড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে শিরক। কারণ, এগুলি সমস্যা সমাধানের জন্য বৈধ মাধ্যম কিংবা শরীয়ত সম্মত ঔষধ নয় । বরং তাবীজ ভক্তরা এসব জিনিসে নিজেদের খেয়াল খুশিতে একথা বি?শ্বাস করে নিয়েছে যে, ওগুলি অমুক অমুক রোগ ব্যাধি থেকে রক্ষা করে। মূর্তি পূজারিরা যেমন তাদের বানানো মূর্তি সম্পর্কে কতকগুলি মূর্তির হাতে

কল্যাণের এবং আর কতকের হাতে অকল্যাণের ক্ষমতা রয়েছে ইত্যাদি ।

তাবীজ সম্পর্কে তাবীজ ভক্তদের অবস্থাও ঠিক তেমনি । মূলত: সেব তাবীজ জাহেলী যুগের أزلام "আযলাম" এর সাদৃশ্যপূর্ণ । "আযলাম" অর্থ হচ্ছে কাঠের অংশ বা টুকরা । জাহেলী যুগের লোকেরা তাদের সাথে তিনটি কাঠ রাখত । কোন কিছু করার ইচ্ছা করলে ঐ কাঠগুলি দ্বারা তারা লটারি করত । এগুলোর একটাতে লেখা ছিল إفعل অর্থ "কর" দ্বিতীয়টিতে লেখা ছিল لا تفعل অর্থ "করো না" এবং তৃতীয়টিতে লেখা ছিল غفل অর্থ "অজ্ঞাত" । লটারিতে "কর" লিখিত কাঠ আসলে কাজের উদ্দেশ্য যাত্রা করত । "করো না" লিখিত কাঠ আসলে, যাত্রা স্থগিত রাখত এবং "অজ্ঞাত" লিখিত কাঠ আসলে পুনরায় লটারি দেয়া হত । আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহ আমাদেরকে এই ভ্রষ্টতার পরিবর্তে একটি উত্তম পদ্ধতি দান করেছেন । আর সেটা হচ্ছে ইস্তেখারার ছালাত ও দু'আ । পরিশেষে বলা যায় যে, কুরআন হাদীসের বাহিরের তা,বিজ সমূহ ভ্রান্ত এবং শরীয়ত বিরোধী, আযলামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং মুসলিমদের 'আমল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন । প্রকৃত তাওহীদবাদীরা এ থেকে অনেক দুরে অবস্থান করে । তাদের অন্তরে আছে প্রবল ঈমানী শক্তি ।তাঁরা আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস রাখে । এ জন্যই তাদের তাওয়াক্কুল শুধু

আল্লাহর উপর । অন্য কিছুর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করা থেকে তারা অনেক দুরে থাকে ।

পূর্বে উল্লেখিত দলিলসমূহ এবং শরীয়ত বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃত বক্তব্য দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, তাবীজ ব্যবহারকারীর মানসিক অবস্থা, তাবীযের স্বরূপ এবং তার মধ্যে লিখিত জিনিসগুলির প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে তাবীজকে শুধুমাত্র একটি হুকুমে আবদ্ধ করা সমীচীন নয় । অনুরূপভাবে, এটাও লক্ষণীয় যে, ছোট শিরক সাধারণ ব্যাপার নয় । তাকে ছোট বলার অর্থ হল- যে বড় শিরকের কারণে অনন্তকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে, তার তুলনায় ছোট । অন্যথায় ছোট শিরক কবীরা গুনাহ সমূহের মধ্যে সর্বাধিক জঘন্য । তার দলীল ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত উক্তি ।

তিনি বলেছেন:

قول ابن مسعود رضى الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا (مصنف عبدالرزاق)

অর্থাৎ আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করা আমার কাছে অনেক উত্তম, গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি বা বস্তু) নামে সত্য শপথ করার চেয়ে । (মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক) শায়খ সোলায়মান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব, ইবনে মাসউদের রা. এই উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন- মিথ্যা হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর নামে শপথ করাকে গাইরুল্লাহর নামের শপথে জড়িত আছে সত্যবাদিতা এবং শিরক । আর আল্লাহর নামের শপথে যদিও মিথ্যাবাদিতা

বিদ্যমান, তবুও তাতে আছে তাওহীদ। তাই ইবনে মাসউদের রা. উল্লেখিত উক্তির তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, ছোট শিরক অন্যান্য কবিরা গুনাহের তুলনায় সর্বাধিক গুরুতর। শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব উল্লেখ করেছেন- বালা-মুসিবত দূর করার জন্য অথবা বিপদ আপদ থেকে হিফাযতে থাকার জন্য গিড়া এবং তাগা ইত্যাদি ব্যবহার করা ছোট শিরক। ছাহাবায়ে কিরামের কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, ছোট শিরক কবীরা গুনাহ সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জঘন্য। কুরআন ও হাদীসে যে সকল দলীলে ছোট শিরকের প্রসঙ্গ এসেছে, সেগুলোতে ছোট বড় শিরকই শামিল। এ জন্যই ছালফে ছালেহীন (ছাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবেঈ তাবেয়ীন) ছোট শিরকের ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত দলীল পেশ করেছেন যেগুলো মূলত: বড় শিরক প্রসঙ্গে এসেছে। ইবনে আব্বাস রা. এবং হুযায়ফা রা. থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿النساء٤٨﴾

অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করল, সে যেন বড় ধরনের অপবাদ আরোপ করল। (সুরা নিসা ৪৮ আয়াত।)

অন্যত্র আল্লাহ ওয়া জাল্লা শানুহু বলেন:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿لقمان١٣﴾

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। (সুরা লুকমান ১৩ আয়াত।)

উক্ত আয়াত-দ্বয়ে يشرك এবং الشرك দ্বারা ছোট বড় সকল শিরকই বুঝানো হয়েছে। রাসূলের সা. কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন গুনাহ সবচেয়ে বড়? রাসূল সা. উত্তরে বলেছেন- যে আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সাথে শিরক করা সবচেয়ে বড় গুনাহ। বুখারী শরীফের কিতাবুত তাফসীর অধ্যায়ে সূরা বাকারাহ এই আয়াত فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ এর তাফসীরে ইবনে আব্বাস হতে বলেছেন- আন্দাদ্ অর্থ হচ্ছে ছোট শিরক। কিয়ামাহ দিবসে ছোট শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিচার কার্য সর্ব প্রথম সম্পন্ন করা হবে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ছোট শিরক কত ভয়াবহ।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহকে সা. বলতে শুনেছি:

إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فاتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء فقد قيل ثم أمر به فسحب علي وجهه حتي ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما فعلت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هوقارىء

فقد قيل ثم أمربه فسحب علي وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب علي وجهه ثم ألقي في النار . (مسلم)

অর্থাৎ কিয়ামাহ দিবসে সর্ব প্রথম তিন ব্যক্তির বিচার কার্য সম্পন্ন করা হবে। তাদের একজন হচ্ছে শহীদ। তাকে আল্লাহর দরবারে নিয়ে আসা হবে এবং তার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমত সমূহ পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে এবং সে সেগুলো চিনবে (স্বীকার করে নিবে)। আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করবেন- তুমি এই নি'আমতগুলির বিনিময়ে কি 'আমল করেছ? সে বলবে, আমি তোমার রাস্তায় যুদ্ধ করেছ যে, তোমাকে বীর বলা হবে। আর তাতো বলা হয়েছে। তখন আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের আর একজন হচ্ছে আলেম, যে নিজে জ্ঞান শিক্ষা লাভ করেছে, অন্যকেও তা শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ তাকে প্রদত্ত নি'আমত সমূহের পরিচয় করিয়ে দেবেন। সে ঐ নি'আমতগুলি চিনতে পারবে। প্রশ্ন করা হবে ঐ সমস্ত নি'আমতের বিনিময়ে তুমি কি কাজ করেছ? সে বলবে- আমি নিজে জ্ঞান শিখেছি এবং অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছি

এবং আপনার জন্য কুরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ বলবেন- তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমিতো এজন্যই ইলম শিখে ছিলে যে, তামাকে আলেম বলা হবে এবং এ উদ্দেশ্যই কুরআন পাঠ করেছিলে যে, তোমাকে কারী বলা হবে। আর তাতো বলা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ নির্দেশ করবেন। সে অনুযায়ী তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের অপরজন হচ্ছে বিত্তশালী, যাকে আল্লাহ অঢেল ধন সম্পদ দান করেছেন। তাকে তাঁর দরবারে হাযির করা হবে। এবং তাকে প্রদত্ত নি'আমতসমূহ আল্লাহ পরিচয় করিয়ে দেবেন, আর সেগুলো সে চিনবে (অর্থাৎ স্বীকার করে নিবে)। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলবেন- এই নি'আমতের বিনিময়ে তুমি কি 'আমল করেছ? সে বলবে, আপনি যে সকল খাতে দান করা পছন্দ করেন, সেগুলির প্রত্যেকটিতে আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য দান করেছি, কোন খাতই আমার দান থেকে বাদ পড়েনি। আল্লাহ বলবেন- তুমি মিথ্যা কথা বললে। তুমিতো সেটা করেছ এ উদ্দেশ্যে যে, তোমাকে দানশীল বলা হবে। আর তাতো বলা হয়েছে। অতঃপর তিনি আদেশ দেবেন, তখন তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। (সহীহ মুসলিম ইমাম নবভীর ব্যাখ্যা সহকারে) যে ভাল কাজে ছোট শিরক মিশ্রিত থাকবে সে 'আমল বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে তার কোন মূল্যই নেই। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, রাসূল সা. বলেছেন যে. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন:

أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معى فيه غيري تركته وشركه (مسلم)

অর্থাৎ আমি শরীকের শিরক থেকে অনেক পবিত্র। যে ব্যক্তি কোন কাজ করবে এবং তাতে আমার সাথে অন্যকেও অংশীদার বানাবে, আমি তাকে তার শিরক সহকারে পরিত্যাগ করব। (সহীহ মুসলিম, নববীর র. ব্যাখ্যা সহকারে)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। এক লোক আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ইচ্ছা করেছে এবং সে (জিহাদের মাধ্যমে) দুনিয়ার সম্পদ (গণিমতের মাল) পেতে চায়। তখন রাসূল সা. বললেন:

لاأجرله فأعاد عليه ثلاثا والنبى صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجر له. (حاكم وأحمد)

অর্থাৎ সে কোন ছওয়াবই পাবে না। ঐ লোক রাসূলের সা. কাছে কথাটি তিনবার পূনারাবৃত্তি করল, কিন্তু প্রত্যেকবারই রাসূল সা. বললেন- (সে কোন ছওয়াব পাবে না) (হাকেম ও মুসনাদে আহমদ)

আবু উমামা আল বাহেলী রা. থেকে বর্ণিতঃ এক ব্যক্তি রাসূলের সা. নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! এক লোক আল্লাহর কাছে ছওয়াব এবং মানুষের কাছে সুনাম অর্জনের জন্য যুদ্ধ করেছে। তার কি প্রাপ্য? রাসূল সা. বললেন- সে কিছুই পাবে না। ঐ ব্যক্তি রাসূলের কাছে প্রশ্নটির একাধারে তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন, আর

রাসূলে কারীম সা. বলে গেলেন- "সে কিছুই পাবে না"। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ গাফুরুর রাহীম কেবল সেই 'আমলই কবুল করেন, যা একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্য করা হয় এবং উহার মাধ্যমে শুধু তাঁর সন্তুষ্টিই কামনা করে। (নাসাঈ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
কুরআন ও হাদীসের তাবীজ দুআ হিসাবে ব্যবহার করার হুকুম

কুরআন, হাদীছ ও ছাহাবাদের মতামতের দলীলের আলোকে ত'বিজ ব্যবহারের হুকুম আমরা আলোচনা করছি। এতে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ব্যবহারকারীর অবস্থা ও তাবীযের বিষয় বস্তুর বিভিন্নতার কারণে ওটা হয়তো বা শিরকে আকবারে (বড় শিরক) নতুবা শিরকে আছগার (ছোট শিরক) বলে গণ্য হবে। এ হুকুমের মধ্যে কোন প্রকার মতপার্থক্য নেই। তবে কুরআন ও হাদীসের তাবীজ ব্যবহার করার মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

এক শ্রেণির আলেমের মতে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত দুআ সমূহের তাবীজ ব্যবহার করা জায়েয। আর এই শ্রেণির তাবীজ উপরোক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। যারা এই মত পোষণ করেন, তারা হলেন: সাঈদ বিন মুসাইয়িব, আতা আবু জাফর আল-বাকের, ইমাম মালেক। এক বর্ণনা মতে

ইমাম আহমদ, ইবনে আব্দুল বার, বাইহাকী, কুরতুবী, ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়িম এবং ইবনে হাজার।

পক্ষান্তরে অধিকাংশ ছাহাবা রা. এবং তাঁদের পরে যারা এসেছেন, তাদের মতে কুরআন ও হাদীসের তাবীজ ব্যবহার করা জায়েয নেই। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, ইবনে আব্বাস, হুযাইফা, উকবা বিন আমের, ইবনে ওকাইম, ইব্রাহীম নাখয়ী, একটি বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদ, ইবনুল আরাবী, শায়খ আব্দুর রহমান বিন হাসান আলুশ শায়খ, শায়খ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব, শায়খ আব্দুর রহমান বিন সা'আদী, হাফেজ আল হাকামী এবং মুহাম্মদ হামিদ আলফাকী। আর সম সাময়ীক মনীষীদের মধ্যে আছেন- শায়খ আলবাণী ও শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায প্রমুখ।

প্রথম মত পোষণকারীদের দলীলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ (الاسراء٨٢)ٌ

অর্থাৎ আর আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করেছি যা রোগের সু-চিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত। (সুরা ইসরা ৮২ আয়াত)

২। আয়েশা রা. বলেন: নিশ্চয়ই তাবীজ ঐ জিনিস যা বালা মুসিবতে পতিত হওয়ার পূর্বে শরীরে যা ধারণ করা হয়। পরে যা ব্যবহার করা হয় তা নয়। (বায়হাকী)

৩। আব্দুল্লাহ বিন 'আমরের রা. ব্যক্তিগত 'আমলে বর্ণিত আছে যে, আব্দুল্লাহ বিন 'আমর রা.

তাঁর ঐ সমস্ত সন্তানদের সাথে তাবীজ ঝুলিয়ে দিতেন, যারা ভয়ের দুআ মুখস্থ করার বয়স পর্যন্ত পৌঁছে।

দুআটি নিম্নরূপঃ

بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون (أحمد والترمذي وأبوداود)

অর্থাৎ আল্লাহর নামে তাঁর পরিপূর্ণ বাণী সমূহের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তাঁর গজব ও শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্টতা থেকে এবং শয়তানদের কুমন্ত্রণা ও তাদের উপস্থিতি থেকে) (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, হাসান)

দ্বিতীয় মত পোষণ কারী গণ, যারা কুরআন ও হাদীসের তাবীজ ধারণ করা নিষিদ্ধ বলেছেন, তারা প্রথম মত পোষণকারীদের দলীল সমূহকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন না।

কুরআনুল কারীম থেকে তাঁদের পেশকৃত আয়াতটি 'মুজমালা' বা সংক্ষিপ্ত। উপরন্তু রাসূল সা. কুরআনে পাক দ্বারা চিকিৎসা করার স্বরূপ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আর তা হল কুরআন তিলাওয়াত এবং সে অনুযায়ী আমল করা। এ ছাড়া কোন কিছু তাবীজ আকারে ব্যবহারের ব্যাপারে রাসূল সা. থেকে কোন বর্ণনা নেই। এমনকি এ ব্যাপারে ছাহাবাদের থেকেও কোন বর্ণনা নেই। তবে আয়িশার রা. উক্তি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, যেহেতু কুরআন থেকে লটকানোর কোন বর্ণনা তাঁর ঐ হাদীসে নেই, বরং শুধুমাত্র

বলা হয়েছে- “তাবীজ” ঐ জিনিস, যা বালা মুছিবতে পতিত হওয়ার পূর্বে (শরীরে) ধারণ করা হয়, পরে নয়। যেহেতু তাঁর এই কথা নিশ্চিতভাবে কিছু বোঝাচ্ছে না, তাই শুধু এই উক্তির ভিত্তিতেই এটা বলা যাবে না যে, আয়িশার রা. মতে কুরআনের তাবীজ ধারণ করা জায়েয।

তা ছাড়া আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর রা. থেকে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা বিশুদ্ধ নয়। কারণ, ঐ হাদীসে মুহাম্মদ ইসহাক বর্ণনায় আন্ আনাহ্ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। অথচ তিনি মোহাদ্দিসগণের নিকট একজন মুদাল্লিস হিসাবে পরিচিত। (আবু দাউদ)

শায়খ মুহাম্মদ হামিদ আল-ফাকি র. ঐ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন- আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর রা. থেকে যে বর্ণনা এসেছে তা দুর্বল এবং এ ব্যাপারে সেটা দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, এই হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইবনে ‘আমর রা. তাঁর বয়স্ক সন্তাদেরকে ভয়ের দুআ মুখস্থ করাতেন এবং ছোট ছোট সন্তানদের জন্য লোহার পাতে লিখে গলায় লটকিয়ে দিতেন। এতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, ছোটদের মুখস্থ না থাকার কারণেই তিনি ওটা লটকাতেন, তাবীজ হিসাবে নয়। যেহেতু তাবীজ লেখা হয় কাগজে, পাতে নয়।

ব্যাপারটা যখন এমন, তখন এটা পরিষ্কার যে, কুরআন ও হাদীসের তাবীজ সমর্থনকারীদের পক্ষে শক্তিশালী কোন দলীলই নেই।

নিম্ন বর্ণিত দলীল সমূহের মাধ্যমে নিষিদ্ধকারীদের মতামতের অগ্রাধিকার প্রতিফলিত হয়:

১। এই আলোচনায় তাবীজ সমূহ হারাম হওয়ার যে সমস্ত দলীল পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলিতে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপকতা বিদ্যমান এবং এর বিপরীতে কোন দলীল আসেনি। অতএব, দলীল গুলি ব্যাপকতার উপর বহাল থাকবে।

২। যদি তাবীজ ব্যবহার বৈধ হত তাহলে রাসূল সা. অবশ্যই স্পষ্ট ভাবে বলে দিতেন। যেমনি ঝাড়-ফুকের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বলেছেন এবং তার মধ্যে যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত নয়, তার অনুমতি দিয়েছেন। রাসূল সা. বলেছেন:

قال اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى مالم يكن فيها شرك (رواه مسلم)

অর্থাৎ তোমাদের ঝাড়-ফুঁক আমার কাছে পেশ কর, ওটা শিরকের আওতাধীন না হলে তাতে কোন প্রকার বাধা নেই। (মুসলিম)

অথচ, তিনি তাবীজ সম্পর্কে এরূপ কিছু বলেন নি।

৩। এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার উপর ছাহাবাদের রা. যথেষ্ট বক্তব্য রয়েছে। আর যারা তার বিরোধিতা করেছেন, তাদের বক্তব্য ঠিক নয়। কারণ, ছাহাবাগণ এবং অধিকাংশ তাবেয়ী রাসূলের সা. হেদায়েত সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। বিশেষ করে ইব্রাহীম নখয়ী ব্যাপক অর্থে বলেছেন যে, তারা কুরআন ও কুরআনের বাইরে যাবতীয় তাবীজ খারাপ মনে করতেন।

শায়খ আব্দুর রহমান বিন হাসান বলেন: এ কথা দ্বারা ইব্রাহীম নখয়ী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের রা. সাথী-সঙ্গীদেরকে বুঝিয়েছেন। যেমন আলকমা, আসওয়াদ, আবু

ওয়ায়েল, হারেছ বিন সোয়ায়েদ, ওবায়দা সঅলমানী, মাসরুক, রাবী বিন খায়সাম এবং সোয়ায়েদ বিন গাফলাহ প্রমুখ প্রসিদ্ধ তাবেয়ীগণ। উক্ত উদ্ধৃতিটি ইব্রাহীম নখয়ী র.তাবেয়ীনদের মতামত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন। হাফেজ ইরাকী এবং অন্যান্যদের বক্তব্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয়। (ফতহুল মজীদ)

৪। শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষেধ কাজ সমূহের পথ বন্ধ করে দোয়া ওয়াজিব, যাতে কুরআনী তাবীযের সাথে শিরকী তাবীজ মিলে না যায়। এ রকম ঘটলে শিরকী তাবীজ নিষিদ্ধ করার সুযোগও থাকবে না।

শায়খ হাফেয হাকামী বলনঃ নিঃসন্দেহে এ নিষেধাজ্ঞা বাতিল ‘আকীদাহ রুদ্ধ করার উত্তম পথ, বিশেষ করে আমাদের এ যুগে। ছাহাবা এবং তাবেয়ীনদের অন্তরে পাহাড়ের চেয়েও বৃহৎ ঈমান বিদ্যমান ছিল এবং তাঁদের সেই যুগ অনেক অনেক পবিত্র ছিল। তা সত্ত্বেও, তাঁদের অধিকাংশই তাবীজকে খারাপ মনে করেছেন।

সুতরাং, আমাদের এ ফিতনার যুগে তাবীজ পরিহার করা অধিক উত্তম। আর কেনইবা পরিহার করা উত্তম হবে না, অথচ তাবীজ পন্থীরা এ সুযোগ হারাম ও অত্যাচারের চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এমনকি তাদের অনেকেই তা’বিজে কুরআনের আয়াত, সুরা, বিসমিল্লাহ অথবা এ জাতীয় পবিত্র জিনিস লিপিবদ্ধ করে,

অতঃপর সেগুলির নীচে শয়তানের তেলেসমাতী লিখে থাকে, যেগুলোর অর্থ ঐ সমস্ত শয়তানী কিতাব যারা পাঠ করেছে, তারা ছাড়া আর কেউ বুঝে না।

অন্যদিকে তারা সাধারণ মানুষের মন আল্লাহর উপর ভরসা করা থেকে বিমুখ করে, তাদের লিখিত তাবীযের প্রতি আকৃষ্ট করে ফেলে। শুধু তাই নয়, ঐ সমস্ত শয়তানদের প্ররোচনার কারণে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। অথচ তাদের কোন কিছুই হয়নি। অতঃপর তাদের প্রতি আসক্তির সুযোগে তাদের সহায়-সম্পদ লুটে নেয়ার ফন্দি আটে এবং তাদেরকে বলে, তোমাদের পরিবারে বা ধন সম্পত্তিতে অথবা উপর এরূপ এরূপ বিপদ আসবে, অথবা বলে- তোমার পিছনে জিন লেগেছে ইত্যাদি। এভাবে এমন কতকগুলো শয়তানী কথা-বার্তা তুলে ধরে যেগুলো শুনে সে মনে করে যে, এ লোক ঠিকই বলেছে এবং তার প্রতি সে যথেষ্ট দয়াবান বলেই তার উপকার করতে চায়। ফলে সরলমনা মূর্খ লোকের অন্তর তার কথা শুনে ভয়ে অস্থির হয়ে যায়। তখন সে আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে এই দাজ্জালের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার উপর ভরসা করতে থাকে।

অবশেষে, তাকে জিজ্ঞেস করে যে, এ বিপদ থেকে বাঁচার উপায় কি? তার প্রশ্ন শুনে মনে হয়-যেন ঐ লোকের হাতেই ভাল-মন্দের চাবি কাঠি। এভাবে ঐ প্রতারক স্বীয় উদ্দেশ্য হাছিল করে নেয়। এবং তার হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য

বলে, যদি তুমি আমাকে এত এত পরিমাণ টাকা দাও বা অমুক জিনিস দাও, তাহলে তোমার এতখানি দৈর্ঘ্য প্রস্তের প্রতিরোধক তাবীজ লিখে দেব এবং আরো সাজিয়ে গুছিয়ে বরে যে, এই প্রতিরোধক তাবীজ অমুক অমুক বস্তু দিয়ে গলায় ধারণ করবে এবং তাবিজটা এই এই রোগের জন্য ব্যবহার করবে।

শায়খ হাফেজ আল হাকামী বলেন: এই বিশ্বাস বা আকীদাহর সাথে আপনি কি মনে করেন যে, এ কাজটি শিরকে আছগর? না, আদৌ তা নয়। বরং সে তাবীযের মাধ্যমে আল্লাহকে বাদ দিয়ে গাইরুল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হল, অন্যের উপর ভরসা করল, অন্যের কাছে আশ্রয় চাইল এবং সৃষ্টির কাজের প্রতি ঝুঁকে পড়ল। আর এভাবে তাবীজকারী তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে সরিয়ে দিল। শয়তান কি কখনো তার ভাই, মানব শয়তানের মাধ্যম ছাড়া এরূপ করার ক্ষমতা রাখে?

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:

قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ

﴿الأنبياء٤٢﴾

অর্থাৎ বলুন: রহমান থেকে কে তোমাদেরকে হিফাযত করবে রাতে ও দিনে। বরং তারা তাদের পালন কর্তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। (সূরা আম্বিয়া ৪২ আয়াত)

অতঃপর সে (মানুষরূপী শয়তান) তাবীযের মধ্যে শয়তানের তেলেসমাতির সাথে কিছু কুরআনের আয়াত লিখে দেয় এবং অপবিত্র অবস্থায় তাবীজটি লটকিয়ে দেয়।

আর এ অবস্থায় সে পেশাব-পায়খানা করে, কামনা বাসনা করে। এক কথায়, সর্বাবস্থায় তার সাথে এ তাবীজ ঝোলানো থাকে। যত অপবিত্র অবস্থায়ই হোক না কেন, সে তার বিন্দু মাত্র পরওয়া কিংবা সম্মানও করে না। আল্লাহর শপথ! কুরআনের চরম শত্রুরাও তার এত অমর্যাদা ও বেইযযতি করেনি, যা এই মুসলিম দাবীদার শয়তানরা করেছে এবং করছে। আল্লাহর শপথ! কুরআন পাক অবতীর্ণ হয়েছে একমাত্র এই লক্ষে যে, মানুষ তা তিলাওয়াত করবে, তার মর্ম অনুযায়ী আমল করবে, তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে, তার বাণী মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে, তার নির্ধারিত সীমার মধ্যে অটুট থাকবে, তার ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং এই বিশ্বাস করবে যে, কুরআনের সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে। অথচ ওরা (তাবীজপন্থিরা) এসব লক্ষ্য ত্যাগ করেছে এবং এগুলোকে তারা পিছনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, একমাত্র তা কাগজে লেখা ছাড়া আর কিছুই বাকি রাখেনি। এভাবে তারা কুরআনকে তারা রুজির মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে, আর এ পন্থায় আয়ের যত হারাম ব্যবস্থা আছে তার সব টুকুই গ্রহণ করে নিয়েছে।

যদি কোন শাসক তার অধীনস্থ কাউকে এ বলে চিঠি পাঠায় যে, এটা কর- ওটা ছেড়ে দাও, তোমার পক্ষ থেকে এভাবে নির্দেশ দাও, আর এভাবে নিষেধ কর ইত্যাদি। আর ঐ ব্যক্তি উক্ত চিঠিটা না পড়ে, তার আদেশ নিষেধ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করে, যাদের কাছে শাসক তা প্রচার করতে

বলেছে, তাদের কাছে না পৌঁছিয়ে, তাকে তাবীজ বানিয়ে হাতে ও গলায় ব্যবহার করে এবং তাত যা লেখা আছে তার প্রতি মোটেও দৃষ্টিপাত না করে, তবে তাকে নিশ্চয়ই উক্ত শাসক কঠিন শাস্তি দেবেন।
অতএব, দুনিয়ার শাসকের নির্দেশ অমান্য করলে যদি এ পরিণতি হয়, তা হলে নভঃমন্ডল ও ভূমণ্ডলের সর্বশক্তিমান অধিপতি, রাজাধিরাজ আল্লাহ প্রদত্ত কুরআনের নির্দেশ অমান্য করলে কি ভয়াবহ পরিণতি হবে তা সহজেই অনুমেয়।
কারণ, তিনি এমন এক সত্তা যাঁর জন্যই সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা এবং যার নিকট সকল কিছুই প্রত্যাবর্তিত হবে। অতএব, তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল কর। তিনিই সবার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করলাম। আর তিনিই আরশে আযীমের অধিপতি। (মা 'রেফুল কুরআন ১/৩৮২)
৫। অনেক সময় কুরআনের তাবীজ ধারণ করায় তার অবমাননা করা হয়। যেমন, তাবীজসহ পায়খানা প্রস্রাবখানায় প্রবেশ করা ইত্যাদি।
৬। যারা কুরআনের অর্থ বুঝে না, অথবা তার সম্মান করতে জানে না, তারা যদি কুরআনের তাবীজ সাথে ধারণ করে, তবে তাদের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াত প্রযোজ্য হয়:

كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا (الجمعة ٥)

অর্থাৎ তারা যেন পুস্তক বহনকারী গর্দভ। (সুরা জুমুআ' ৫ আয়াত)

কারণ, তারা তার মর্ম বুঝে না, তার সম্মান সম্পর্কে অজ্ঞ, এমনকি অনেক সময় তার উপর নাপাক লাগিয়ে দেয় যখন সে পাগল বা ভাল মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা রাখে না।
৭। কুরআনের তাবীজ ধারণ করলে সাধারণত: মোআওয়াজাতাইন (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পড়ার সুন্নত প্রথা পরিত্যক্ত হয়ে যায়। কারণ, যারা সম্পূর্ণ কুরআন গলায় ঝুলায় তারা মনে করে- সূরা ফালাক, নাস ও আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি পাঠ করে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, পূর্ণ কুরআনই তো তারা ধারণ করে আছে।
৮। কুরআনের তাবীজ ঝোলানোর ব্যাপারটা, দলীলের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা থাকার কারণে জায়েয কি হারাম সেটা বলা দুষ্কর। আর যে মাসলাহর অবস্থা এরূপ হয়, ফিতনা ফাসাদ থেকে বাঁচার জন্য সেসব কার্য পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
তাবীজ ব্যবহার: অতীত ও বর্তমান

তাবীজ ব্যবহার জাহেলী যুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সে যুগে মানুষের উপর চেপে বসেছিল অজ্ঞতা, আর তারা পরিণত হয়েছিল শয়তানের দাসে। তাই বৃদ্ধি পেয়েছিল তাদের ভ্রষ্টতা। যেমন, আল্লাহ তা,আলা বলেন:

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿الجن٦﴾

অর্থাৎ আর কতিপয় মানুষ কতক জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত। (সূরা জিন ৬ আয়াত)

জাহেলী যুগের ইতিহাসে উল্লেখিত হয়েছে যে, তৎকালীন আরবরা যখন কোন বিশাল মরু প্রান্তরে বন্য পশুদের এলাকায় গিয়ে পৌঁছতো তখন ভূত-প্রেত, জিন ও শয়তানের আশঙ্কা করত এবং কাফেলার মধ্যস্থিত একজন দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে এই বলে আওয়াজ দিত- আমরা এ উপত্যকারা সরদারের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তখন তারা কোন বিপদের সম্মুখীন হত না এবং উক্ত আওয়াজ তাদের জন্য নিরাপত্তা হিসাবে গণ্য করত। এজন্যই জাহেলী যুগের লোকেরা বিভিন্ন পশু জবাই করে নিজেদের নৈকট্য লাভের চেষ্টা করত, যাতে তার কোন প্রকার ক্ষতি সাধন না করে। তাদের কেউ ঘর নির্মাণ করলে কিংবা কোন কূপ খনন করলে জিনদের ক্ষতি রোধের লক্ষে পশু জবাই করত। এভাবেই তাদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধ মূল হয়ে গেল যে, কোন কোন পাথর, গাছপালা, জীবজন্তু এবং খনিজ পদার্থের এমন এমন গুণাবলি রয়েছে, যেগুলি তাদেরকে জিনের ক্ষতি এবং মানুষের বদ নজর থেকে রক্ষা করে। তাই সেগুলি দিয়ে তাবীজ বানিয়ে ব্যবহার করতে লাগল এবং সে গুলির উপর পূর্ণ ভরসা করতে লাগল। মূলতঃ এর প্রধান কারণ ছিল আল্লাহ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা, এবং

তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা ও বিশ্বাস না থাকা। এ কারণেই তাদের তাবীজ ব্যবহার ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তাদের কাছে প্রচলিত তাবীজগুলি নিম্নরূপ.

১। আননাফরা এটা এক ধরনের তাবীজ যা জিন ও মানুষের বদ নজর থেকে হিফাযতে থাকার জন্য শিশুদের হাত, পা কিংবা গলায় বেঁধে দেয়া হয়। আবার কখনও অপবিত্র জিনিস দ্বারা 'নাফরা' নামক তাবীজ দেয়া হত। যেমন ঋতু স্রাবের ন্যাকড়া, হাড় ইত্যাদি। কখনও বা বিশ্রী নাম দিয়ে তাবীজ বানাত। যেমন قنفذ কনফয ইত্যাদি।

২। শৃগাল কিংবা বিড়ালের দাঁত।

৩। العقرة আকরা- এটা ঐ তাবীজকে বলা হয়, যা মহিলারা বাচ্চা না হওয়ার কারণে কোমরে বাঁধে।

৪। الينجليب ইয়ানজালীব- স্বামী রাগ করলে বা কোথাও রাগ করে চলে গেলে তার মনকে স্ত্রীর প্রতি অনুরাগী করার জন্য কিংবা তার ফিরে আসার জন্য যে তাবীজ ব্যবহার করা হয় তাকে ইয়ানজালীব বলে।

৫। التولة তিয়ালা القزحلة কারযাহালা, دردبيس দারদাবীস, الكحلة কাহলা الكرار কারার এবং الهمرة হামরা- এসব হচ্ছে পূতি জাতীয় তাবীজ। স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার জন্য এগুলি ব্যবহার করা হয়। কারার এবং হামরা- এর জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট মন্ত্রঃ

يا كرار كريه يا همرة اهمريه أن أقبل فسريه وأن أدبر فضريه من فرجه إلى فيه.

বলা বাহুল্য যে, এই মন্ত্র আল্লাহর ربوبية রবূবিয়্যত ও إلهية ইলাহিয়াত এর ক্ষেত্রে বড় শিরক।

কারণ, মন্ত্রের ربوبية এই অংশে এই ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এটা ক্ষতি ও উপকারের মালিক। আর ইহাই হচ্ছে রাবূবিয়্যতের শিরক। অনুরূপভাবে, এই মন্ত্রে গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তার কাছে দু'আ চাওয়া হয়েছে إلهية অংশে। সুতরাং, এটা ইলাহিয়াতের শিরক। আল্লাহ আমাদেরকে এসব শিরক থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন।

৬। الخصمة খাছমা- এই তাবীজ রাজা-বাদশাহ কিংবা বিচারকের কাছে যাওয়ার সময়, মামলায় জিতার জন্য আংটির নীচে, জামার বোতামে অথবা তরবারীর কভারে ব্যবহার করা হয়।

৭। العطفة আতফা- এটা ব্যবহারকারীর প্রতি মানুষের দয়া মায়া সৃষ্টি হবে বলে ধারণা করা হয়।

৮। السلوانة সালওয়ানা- এটা সাদা পূতি জাতীয় বস্তু দ্বারা তৈরি তাবীজ। বালুতে পুতে রাখলে কাল হয়ে যায়। অতঃপর সেখান থেকে উঠিয়ে তা ধৌত করে অস্থির মানুষকে পানি পান করালে সে শান্তি ফিরে পায় বলে মনে করা হয়।

৯। القبلة কাবলা- বদ নজর থেকে রক্ষা পাবার জন্য সাদা পূতির এ তাবীজ ঘোড়ার গলায় বেঁধে দেয়া হয়।

১০। الودعة ওয়াদাআ- এটি পাথরের তাবীজ। বদ নজর থেকে হিফাযতে থাকার উদ্দেশ্যে এটাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়।

১১। যাকে সাপে দংশন করেছে, তার গলায় স্বর্ণের অলংকার বেঁধে দেয়া, আর ধারণা পোষণ করা যে, এরকম লোকের গলায় সীসার অলংকার ঝোলানো হলে সে মারা যাবে।

১২। যাদু ও বদ নজরের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য খরগোশের হাঁড় ব্যবহার করা হয়।

১৩। تحويطة তাহবীতা লাল ও সাদা রংয়ের তাগায় ছিগা তুলে মহিলার কোমরে বাঁধা হয় এবং তাতে পূতি ও রৌপ্যের চন্দ্র গেঁথে দেয়া হয়। ঐ তাবীজ তাদের ধারণা মতে বদ নজর থেকে হিফাযত করে।

এগুলি হচ্ছে, জাহেলী যুগের তাবীজ সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস ও কিছু কুসংস্কারের চিত্র। তাবীযের আকার আকৃতি বা ধারণা পরিবর্তন হলেও আকীদাহ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এগুলির অনেকটাই বর্তমান সমাজে বিদ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, জাহেলী যুগে যে ব্যক্তি বদ নজর থেকে বাছার জন্য ঘোড়ার গলায় খেজুরের ছিলা লটকাত এবং বর্তমানে বদ নজর থেকে বাঁচার জন্য যে জুতা লটকায় এত দু ভয়ের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের হুকুম

অভিন্ন। শায়খ নাছিরুদ্দিন, আল-বানী من علق تميمة فقد أشرك এই হাদীছকে সহীহ আখ্যায়িত করার পর তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, তাবীজ ব্যবহারের এই গোমরাহী বেদুঈন-কৃষক থেকে শুরু করে অনেক শহুরে লোকদের মধ্যেও ছড়িয়ে আছে।

এভাবে দেখা যায়, অনেক ড্রাইভার তাদের গাড়ীর সামনের গ্লাসে তাগায় পূতি গেঁথে তা ঝুলিয়ে রাখে। অনুরূপভাবে, বাড়ি অথবা দোকানের সামনে ঘোড়ার খুরের লোহার আংটি ঝুলিয়ে রাখা হয়। এ সকল জিনিস ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বদ নজর থেকে হিফাযতে থাকা। আসলে এ ধারণাগুলি তাওহীদ, শিরক ও মূর্তি পূজা সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। যুগে যুগে মানব সমাজে রাসূল প্রেরণ করার পিছনে যে কারণ ছিল, তা হল সমস্ত শিরক, মূর্তি পূজা, ইত্যাদি দুর করে তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করা। সুতরাং, আজকের দুনিয়ায় মুসলিমদেরকে অজ্ঞতা, দ্বীন থেকে তাদের দুরত্ব ইত্যাদি থেকে রক্ষা করার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছি।

মুসলিমরা যে শুধু দ্বীনের বিরোধী কাজ করে তাই নয় বরং তাদের অনেকেই এরূপ ধারণা পোষণ করে যে, এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, দালায়েল আল-খাইরাত গ্রন্থের লেখক শায়খ আল-জাযুলী বলেছেন:

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم (سلسلة الأحاديث الصحيحة)

অর্থাৎ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ সা. এবং তাঁর বংশধরের উপর শান্তি বর্ষণ করুন, ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ কবুতর গাইতে থাকে, পাখিরা ঘোরাফেরা করতে থাকে। (আস্ সিলসিলাহ আস-ছহীহা)

বর্তমানেও অনেক দেশে বই আকারে শিরকী তাবীজ সমূহ ছাপানো হয় "আকবর" নামক কক্ষ পথে চন্দ্রের অবস্থান কালে সেই তাবীজগুলোতে বিচ্ছুর ছবি অঙ্কন করা হয়। এই তাবীজ সম্পর্কে ধারণা পোষণ করা হয় যে, এটা যার হাতে বাঁধা থাকবে তাকে বিচ্ছু দংশন করবে না।

আল্লামা আশ্ শকীরী তার রচিত আস্সুনান ওয়াল-মুবতাদা'আত নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, যে সমস্ত শিরকী তাবীজ বর্তমান যুগে প্রসার লাভ করেছে, সেগুলির মধ্যে একটি নিম্নে প্রদত্ত হল। এই তাবীজ ঐ লোকের জন্য লেখা হয়, যার চক্ষু জ্বালা যন্ত্রণা করে।

তাবীজটিতে লেখা হয়:

قل هو الله أحد * إن في العين رمد * احمرار في البياض * حسبي الله الصمد *

يا الهي باعترافي * في اعتزالك عن ولد * عاف عيني يا الهي * اكفني شر الرماد * ليس لله شريك * لا ولا كفوا احد*

অর্থাৎ বলুন আল্লাহ এক, চোখে জ্বালা যন্ত্রণা করছে, চোখের সাদা অংশ লাল হয়ে গেছে, অমুখাপেক্ষী আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। প্রভু হে! আমি স্বীকার করছি, তুমি সন্তান থেকে পবিত্র, হে আল্লাহ আমার চক্ষু ভাল করে দাও, চোখের জালা যন্ত্রণা দুর করে দাও। আল্লাহর কোন অংশীদার নেই, নেই তাঁর কোন সমকক্ষ।

লক্ষণীয় যে, উক্ত তাবীজ কুরআনের সাথে কবিতা মিশ্রিত করা হয়েছে, অথচ কুরআনকে কবিতা থেকে পবিত্র রাখা আমাদের কর্তব্য। (সুনান ও বিদ'আত)

আল্লামা আশশাকীরী كتاب الرحمة في الطب والحكمة নামক কিতাবে এরকম আরেকটি তাবীযের কথা উল্লেখ করেছেন যার দ্বারা অন্ধের তদবীর করা হয়:

عزمت عليك ايتها العين بحق شراهيا براهيا ادنواي أصباؤت آل شداى

عزمت عليك أيتها العين التي في فلان بحق شهت بهت اشهت (المصدر السابق)

এই তা'বিজে শয়তানের নামে শপথ করা হয়েছে, সেটা শিরক ও কুফরের অন্তর্ভুক্ত। (আলালাহ আমাদেরকে কুফর ও শিরক থেকে হিফাযত করুন)।

শায়খ আরো একটি তাবীযের বর্ণনা দিয়েছেন। তাবীজটি নিম্নরূপ:

الم تر كيف فعل ربك بالقرينة الم يجعل كيد القرينة في تضليل وارسل عليالقرينة طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعل القرينة كعصف مأكول يا عافى يا شديد ذا الطول (السنن المبتدعات ٣٣٢)

এটা কি কুরআনের সাথে খেলা করা নয়? কুরআন বিকৃতি নয়? কুরআনের সাথে বিদ্রূপ করা নয়? এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, যারা বলেছেন- কুরআনের তাবীজ হারাম তাদের কথা অনেক শক্তিশালী এবং অগ্রাধিকার যোগ্য। কারণ, এর দ্বারা ঐ সমস্ত শিরকের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, যেগুলির কিছু দৃষ্টান্ত একটু আগে আমরা পেশ করলাম। শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায বলেন- যে সকল মন্ত্র রোগী ও শিশুদের সাথে ঝুলিয়ে দেয়া হয়, সেগুলিও তামিমা- এর অন্তর্ভুক্ত। তাই সেগুলি ব্যবহার করা হারাম হবে, এটাই বিশুদ্ধ রায়। এসব শিরক হিসাবে পরিণত হবে। কারণ, রাসূল সা. এরশাদ করেছেন:

من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك وقوله صلى الله عليه وسلم الرقي والتمائم والتولة شرك

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাবীজ ঝুলাবে, আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ বা সমাধা করবেন না। যে ব্যক্তি কড়ির তাবীজ ঝুলাবে, আল্লাহ তাকে শান্তি দেবেন না। নিশ্চয়ই ঝাড়-ফুক কিংবা মন্ত্র, তাবীজ এবং বিশেষ ধরনের ভালোবাসার তাবীজ ব্যবহার করা শিরক। আর যে তাবীজ ব্যবহার করল, সে শিরক করল।

কুরআন হাদীসে তাবীযের ব্যাপারে এই মর্মে মতবিরোধ রয়েছে যে, এটা হারাম কিনা। বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, এটা হারাম। কারণ, প্রথমত: তামীমা প্রসঙ্গে যে সকল হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সবগুলোই ব্যাপক। অতএব, এগুলি কুরআনের হোক কিংবা কুরআনের বাইরের হোক কিংবা কুরআনের বাইরের হোক, সকল তাবীজকেই শামিল করে।
দ্বিতীয়ত: শিরকের পথ বন্ধ করে দেয়ার নিমিত্তে সকল তাবীজ হারাম হওয়া উচিত। কারণ, কুরআনের তাবীজ বৈধ গণ্য হলে, সে পথে অন্যান্য তাবীযের আগমনও শুরু হবে। সেগুলি এবং কুরআনের তাবীজ একাকার হয়ে জটিল অবস্থার সৃষ্টি করবে। এভাবে নির্দ্বিধায় সকল তাবীযের ব্যবহার শুরু হয়ে যাবে এবং শিরকের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এটা সকলেরই জানা যে, যে সমস্ত মাধ্যম বা উপকরণ মানুষকে শিরক কিংবা গুনাহর দিকে নিয়ে যায়, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া শরীয়তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধান।
শায়খ মুহম্মদ ছালেহ বিন 'ওছায়মিন তাবীজ সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন- তাবীজ দুই ধরনের হয়ে থাকে।
১। কুরআনের তাবীজ এবং
২। কুরআন ছাড়া অন্যান্য জিনিসের তাবীজ, যার অর্থ বোধগম্য নয়। প্রথম প্রকারের তাবীযের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল স্তরের আলেমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তাদের কেউ কেউ তাবীজকে এই বলে জায়েয

গণ্য করেছেন যে, তা কুরআনের নিম্নোক্ত দুটি আয়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং এটা ব্যবহার করা, তার দ্বারা মন্দ ও অকল্যাণ দুর করা কুরআনি বরকতের অন্তর্ভুক্ত।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (الاسراء٨٢)

অর্থাৎ আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য রহমত। (সূরা ইসরা ৮২ আয়াত)

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ (ص ٢٩)

অর্থাৎ এক কল্যাণময় কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। (সূরা সাদ ২৯ আয়াত)
আর কিছু সংখ্যক আলেমের মতে, এটা সম্পূর্ণ নাজায়েয। কারণ, নবী কারীম সা. থেকে সাব্যস্ত হয়নি যে, ওটা মন্দ দুর করার বা তা থেকে হিফাযতে থাকার শরীয়ত সম্মত মাধ্যম। এ সমস্ত ক্ষেত্রে মূল নীতি হল الوفيق তাওফীক।
এটাই নির্ভরযোগ্য। তাই কুরআনের হলেও, তাবীজ ঝোলানো নাজায়েয। এভাবে রুগির বালীশের নীচে রাখা, দেয়ালে ঝোলানো ইত্যাদি সবই নাজায়েয। এ ব্যাপারে শুধু এটুকুই শরীয়ত সম্মত যে, রুগ্ণ ব্যক্তির জন্য দুআ করা যাবে এবং সরাসরি তার উপর পাঠ করা যাবে, যেমন রাসুলুল্লাহ সা. করতেন।

পরিশিষ্ট

মহান আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের সাহায্যে এ সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি শেষ হল। আলোচনার বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে প্রদান করা হল।

১। তাবীযের ব্যবহার জাহেলী যুগ থেকেই প্রচলিত হয়ে আসছে এবং তাবীজ সম্পর্কে তাদের মধ্যে নানা রকমের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণা প্রসিদ্ধ ছিল।

৩। তাবীজ ব্যবহারে ‘আকীদাহ- বিশ্বাসে ক্রটি এবং চিন্ত াধারায় ঈমানের দুর্বলতা প্রকাশ করে।

৪। ব্যবহারকারী এবং তাবীযের বিষয়বস্তু অবস্থা ভেদে কখন বড় শিরক, আবার কখনও বা ছোট শিরক হয়।

৫। যাদুকর কিংবা উহা সমতুল্য ভণ্ড লোকদের কারণে আজ পর্যন্ত মানব সমাজে তাবীযের ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে।

৬। কল্যাণ বা ক্ষতি সাধন দুর করার জন্য তাবীজ শরীয়ত সম্মত কোন মাধ্যম নয় এবং স্বাভাবিক মাধ্যমও নয়।

৭। সর্বসম্মত মত এই যে, কুরআন ও হাদীছ শরীফের তাবীজ ব্যবহার নিষিদ্ধ।

সহায়ক উৎস নির্দেশ

১। তারগীব- তারহীব: হাফেজ মূনযেরী।

২। তাফসীরে তাবারী: আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারীর।

৩। তাফসীর আল-কুরআনুল আযীম: ইবনে কাসীর।

৪। আত্-তাহ্দীদ আন তাওহীদুল খালাক ফী জওয়াবে আহ্লুল ইরাকঃ শায়খ সুলাইমান বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ‘ওয়াহ্হাব।

৫। তাহজীবে মাদারেজুস ছালেকীনঃ আব্দুল মুনইম আল-আলী।

৬। তাইসরুল আযীযুল হামীদঃ শায়খ সুলাইমান বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ‘ওয়াহ্হাব।

৭। আল জওয়াবুল কাফী লিমান সাআ’লা আনিদ দাওয়া উশ-শাফীঃ আল্লামা ইবনুল কাইয়ম আল-জাওজীয়াহ্।

৮। সিলসিলাতুল আল আহাদীছ আছ-ছহীহাঃ নাসির-উদ-দীন আলবানী।

৯। আস্ সুনান ওয়াল বিদ‘আতঃ মুহাম্মদ আব্দুস সালাম খদর।

১০। সুনানে কুবরাঃ হাফেয আবু বকর আল বায়হাকী।

১১। সুনানে নাসাঈ- শরাহঃ হাফেয জালালুদ্দীন সূয়ুতী।

১২। সুনানে আবী দাউদ- তা’লিকঃ ইয্যত ‘ওবায়েদ।

১৩। সুনানে ইবনে মাজাহ- তাহকীকঃ আহমদ শাকের।

১৪। সুনানে তিরমিযী- তাহকীকঃ আহমদ শাকের।

১৫।শিরক ওয়া মাজাহেরুহুঃ মুবারক বিন মুহাম্মদ আল-মাইলী।

১৬। সহীহ ইবনে খুযাইমা- তাহকীকঃ মুহাম্মদ আজমী।
১৭। সহীহ বুখারীঃ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী।
১৮। সহীহ মুসলিমঃ মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল কুশাইরী।
১৯। আল-ফতাওয়াঃ শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায।
২০। ফতহুল বারীঃ হাফেজ শিহাব উদ্দীন ইবনে হাজর আসকালানী।
২১। ফতহুল মজীদঃ শায়খ আব্দুর রহমান বিন হাসান।
২২। আল-ফছল ফীল মিলালঃ ইবনে মুহাম্মদ আলী ইবনে হযম জাহেরী।
২৩। কুররাতুল উয়ুনিল মুওয়াহেদীনঃ শায়খ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব।
২৪। আল কওলুস সাদীদ ফী মাকাছিদুত্ তাওহীদঃ আব্দদুর রহমান বিন নাসের আস্-সায়াদী।
২৫। লিসানুল আরবঃ জামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন মনযুর।
২৬। মজমায়ুল জাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদঃ হাফেজ আলী বিন নাসের আবু-বকর হায়ছামী।
২৭। আল-মাজমুউস সামীন মিন ফতওয়াঃ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল উসাইমীন।
২৮। মাদারিজুস সালেকীনঃ আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম জাওযীয়া।
২৯। মুস্তাদরীকে হাকীমঃ হাফেজ আবু আব্দুল্লাহ নিসাপুরী।
৩০। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল।
৩১। আল মুসান্নাফঃ হাফেয আবু বকর আব্দুল রায্যাক সনয়ানী।

৩২। আল মুসান্নাফঃ হাফেয আবু বকর বিন আবী শায়বা।
৩৩। মায়ারেজুল কবুলঃ হাফেয ইবনে আহমদ হকামী।
৩৪। আল মুফাস্সাল ফী তারীখিল আরবঃ জাওয়াদ আলী।
৩৫। মুয়াত্তাঃ ইমাম মালেক রহ.।
৩৬। আন-নিহায়া ফী গরীবুল হাদীছঃ ইবনুল আসীর।

সমাপ্ত